প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস, সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম আড়াই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি

ভূমিকা

ইন্দোচীনের বীরগণ, তোমরা মানুষের কল্যাণে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছ, তোমাদের প্রশংসা আমার মত নরাধমের দ্বারা সম্ভবপর নয়। তোমাদের দীর্ঘ নিশ্বাস এবং অপূর্ব কর্ম ক্ষমতার ফল পরবর্তী মানুষ ভোগ করুক এই হল তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যার পেছনে পাবার কিছুই নাই তাকেই বলে নিষ্কাম কর্ম—সেই নিষ্কাম কর্মের সুফল ফলবেই। ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীরগণ, তোমরা অমর হয়ে থাকবে।

গ্রন্থকার

স্মরণে

"ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর" অর্পণ করলাম আমার ভাইপো ৺সত্যনারায়ণ বিশ্বাসের স্মরণার্থে। নন্-কো-অপারেসনের যুগে নারায়ণের বুকের হাড় পুলিশের ডাণ্ডার আঘাতে ভেংগেছিল। সেই হাড় মামুলীভাবে জোড়া লাগে—তবুও আমার সেই ভাইপো দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে আসামের জংগল পরিস্কার করতে গিয়েছিল। আসামের জংগল পরিস্কারের গুরুভার তার সইল না। তার হয়ে আমি বলছি "বিদ্রোহ বেঁচে থাক।"

গ্রন্থকার

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

১৯৩১ সাল। পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। সাধারণ ভাবছিল হয়ত যুদ্ধ বাঁধবে। কিন্তু সেই থমথমে ভাবটা ক্রমেই কেটে যাচ্ছিল। চীন দেশের বন্যার সংবাদ সকলের মন অধিকার করে বসেছিল। তারপর আসতেছিল ডাকাতির সংবাদ। কোথায় কে ডাকাতি করে সে কথা কেউ জানত না অথচ ডাকাতির কথা নিয়ে সকলেই আলোচনা করত। অনেকে এক দেশ হতে অন্য দেশে যেতে ভয় পেত। বিদেশাগতদের দেখা পেলেই ডাকাতির কথা জিজ্ঞাসা করত। যুদ্ধের থমথমে ভাব লোপ পেল। চীনের বন্যার কথা লোকে ভুলে গেল। ডাকাতির কথা নূতন করে ভাবতে লাগল।

ডাকাতদের পাকড়াও করে শাস্তি দেবার জন্য আন্তর্জাতিক সংঘ গঠন হল। ডাচ্, বৃটিশ, ফরাসী, চিয়াংকাইসেক্ এবং জাপানী সেই সংঘে যোগ দিল। সাধারণ লোক ভাবল এবার পূর্ব এশিয়ার শান্তি আসবে। কিন্তু আসল খবর যে কি তা সর্বসাধারণ জানতে না পেরে ডাকাতির সংবাদ সংগ্রহ করেই দুর্বল মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগল

চীনে চালিন (CHALIN সোভিয়েট স্থাপন হয়েছিল। ইন্দোচীনে যুবক যুবতীর মজুর এবং চাষাদের মধ্যে চেতনা আনবার

জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। কোরিয়াতে ছোটখাট বিদ্রোহ হতেছিল। জাভাতে জাভানী যুবসম্প্রদায় পান্ ইসলামের কথা ভুলে গিয়ে পূর্ব এশিয়ায় কি হচ্ছে তাই চিন্তা করতেছিল। এমনি সময়ে আমি শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাংককে পৌছেছিলাম।

ব্যাংককের অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, মন্দির, বাগান বাড়ি এবং মহা বিদ্যালয় দেখার পর সাধারণ লোকের সংগে মেলামেশা শেষ করে ইন্দোচীনে যাবার কথা ভাবছিলাম। কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ী আমাকে ইন্দোচীনে যাবার জন্য উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন "এই ত কয়েক মাস পূর্বে বঙ্গের বাবাসোলা এবং বমগড়া ইন্দোচীন হয়ে এসেছেন, আপনিও সে দেশটা দেখুন?" দেখতে বল্লেই দেখতে যাওয়া যেতে পারে না। পাস্‌পোর্ট থাকলেই রওয়ানা হওয়া যায় না। ভিসা (প্রবেশ পত্র) নিতে হয়। তারপর রওয়ানা হতে হয়।

ভিসা নেওয়ার জন্য ফরাসী কন্‌সালের বাড়িতে গেলাম। কন্‌সাল মহাশয় আমার সংগে কথা বলার দরকার মনে করলেন না, এমন কি বললেন না যে তিনি আমার সংগে কথা বলতে চান না। অবশেষে কন্‌সাল মহাশয়ের ঘর হতে বের হয়ে আসতে বাধ্য হলাম এবং একজন কেরাণীর সংগে দেখা করলাম। কেরাণী ছিলেন শ্যামদেশের বাসিন্দা। তিনি আমার প্রতি দয়া দেখালেন এবং পাস্ পোর্টে ভিসা করে দিলেন। ভদ্রলোকের ব্যবহারে সুখী হয়েছিলাম এবং ফরাসী কন্‌সালের অপব্যবহারে সেদিন রাত ঘুমাতে পারছিলাম না।

ভিসা পাওয়া হয়ে গেল, সাইকেলের যে সকল অংশ (Parts) বদলী করার ছিল তাও সেরে নিলাম। এবার রওয়ানা হবার পালা। পূর্বপরিচিত অ্যাডিশ্যাম নামক এক ভদ্রলোকের সংগে দেখা হল। তিনি আমাকে পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলেন। তিনি ছিলেন নানা ভাষায়

পণ্ডিত। ইংলিশ, ফ্রেন্চ, বাংলা, শ্যাম এবং তেমিল ভাষায় অনর্গল লিখতে এবং পড়তে পারতেন। কথা প্রসংগে একদিন তাকে ডাকাতির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যেমন ছিলেন নানা ভাষায় পণ্ডিত তেমনি পৃথিবীর সংবাদ তার নখদর্পণে ভাসত। আমাকে তখনকার দিনের পলিটিক্স বুঝিয়ে দিয়ে হাতে কলমে যাতে কিছু অনুভব করতে পারি সেজন্য একদিন একটি ক্লাবে নিয়ে যান। ক্লাবের মেম্বর ছিলেন শ্যাম দেশের অফিসারবৃন্দ। তাদের কাছ থেকে আমার অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়। সেখানেই বুঝতে পেরেছিলাম, শুধু ক্লাবে গেলে চলবে না, সংবাদ পত্রের সম্পাদক হতে আরম্ভ করে রিপোর্টার পর্যন্ত সকলের সংগে মেলামিশা করতে হবে তবে পাওয়া যাবে বর্তমান পলিটিক্সের প্রকৃত তথ্য।

শ্যাম ভাষায় অনেকগুলি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হত, তার মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট এবং যার প্রচার সবচেয়ে কম সেই অপিসে যাওয়াই ঠিক করলাম। অ্যাডিশ্যাম আমার সংগে যাবেন না ঠিক হল। নিজেই রওয়ানা হলাম সে অপিসটা খুজতে। অপিস খুজতে অনেকক্ষণ লাগল। যখন অফিসে পৌছলাম তখন অল্প কয়েকজন রিপোর্টার এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। সকলের সামনে গিয়ে আমার পরিচয় দেবার পর সম্পাদক বললেন—"আপনার আসার সংবাদ আমাদের পত্রিকায় বের হয়েছে, এখন বলুন আর কি করতে পারি?" শুধু বললাম, করবার মত কিছুই নেই, শুধু আপনার উপদেশ পেতে এসেছি। বেংককের যত সংবাদপত্র আছে তার মধ্যে আপনার সংবাদ পত্রের সম্পাদনা এবং মালীকানা সত্ব উভয়ই আপনি বজায় রাখছেন—সেজন্যই আপনার কাছে এসেছি। আমার মনে হয় আপনাদের দেশে কিছু পরিবর্তন অতি সত্বরই হবে, সে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

সম্পাদক একটু চিন্তা করে কি একটা কথা শ্যাম ভাষায় বললেন তারপর ইংলিশে সেই কথাটাই আবার আমার কাছে বল্লেন। তিনি যা বলেছিলেন তার সবটাই বুঝতে পেরেছিলাম। কথাটার সার মর্ম্ম ছিল শ্যাম দেশেও একটা বিদ্রোহ সত্বরই হবে এবং সে বিদ্রোহ হতে রেহাই পাবার জন্য শ্যাম সরকার ডাকাত পাকড়াও করার দলে যোগ দিয়েছে।

সংবাদ পত্র অপিস হতে ফিরে এসে অ্যাডিশ্যামকে নিয়ে আর একটি ক্লাবে যাই। অ্যাডিশ্যাম ক্লাব ঘরটি দেখিয়ে দিয়েই সরে পড়েন। আমি ভাবলাম এ আবার কি? আমাকে না বলে চলে যাওয়া অ্যাডিশ্যামের পক্ষে অন্যায় হয়েছে। তাকে খুজতে আর গেলাম না, ক্লাবের দিকে রওয়ানা হলাম।

বড় পথের পাশেই একটা দোতলা বড় ঘর। ঘরটার পাশ দিয়ে ট্রাম লাইন চলে গেছে। তখন একখানা ট্রাম চলছিল। ট্রামের গতি অতি দ্রুত। কি জানি যদি ট্রামে চাপা পড়ি সেজন্য ট্রাম চলে যাবার অপেক্ষা করলাম। ট্রাম চলে গেলে সাইকেলটা বাইরে না রেখে একেবারে ক্লাব ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে, যাকেই সামনে পেতে লাগ্লাম তাকেই ভিক্ষা পত্র বিতরণ করতে আরম্ভ করলাম। সকলেই মন দিয়ে আমার ভিক্ষাপত্র পড়তে লাগল। আমিও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে একখানা চেয়ারে বসে ভিক্ষার অপেক্ষায় থাকলাম। কতক্ষণ পর দুজন ভদ্রলোক আমার কাছে আসলেন। একজন যুবক অন্যজন প্রৌঢ়। যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "ইংলিশ বুঝেন?" উপহাস করে বল্লাম "ইংলিশ বুঝিনা মশাই, আমেরিকান্ বুঝি।" "বেশ বেশ তাই ভাল, আমরাও ইংলিশ বুঝি না, আমরাও শুধু আমেরিকান্ই জানি। এখন কথা হল এই ভিক্ষা পত্রে লিখা রয়েছে, "উপদেশও চাই

অর্থও চাই" আমাদের কি দুটাই দিতে হবে?" "আজ্ঞে হাঁ, দুটা নয়, তিনটা, অর্থ, উপদেশ এবং বন্ধুত্ব।" তাই হবে বলেই এক যুবক আমার হাত ধরে একটি প্রাইভেট রুমে নিয়ে গেলেন এবং বল্‌লেন "আমরা আপনাকে দশ টিকেল (সারে বার টাকার সমান) দেব ঠিক করেছি, এই ত গেল টাকার কথা এখন উপদেশটা কি রকমের চাই?" বল্‌লাম "এই ধরুন আপনাদের দেশের পূর্ব সীমান্তে নানারূপ ডাকাতি হচ্ছে শুন্‌তে পাচ্ছি, কেউ বলছে এসব বাজে কথা আর কেউ বলছে সত্য ঘটনা। আপনারা যদি এখন আমাকে সেদিকে যেতে নিষেধ করেন তবে সেদিকে যাব না, এসম্বন্ধেই আমি আপনাদের কাছ থেকে উপদেশ চাইছি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু রাগ দেখিয়ে বল্‌লেন "পর্যটকের যদি মরণ ভয় থাকে তবে পর্যটনে বের হওয়াই অন্যায় হয়েছে। সিংগাপুরে ফিরে যান। ডাকাত ডাকাতি করে, চোর চুরি করে, তা বলে কি লোক ঘরে বসে থাকে? এ সম্বন্ধে আমরা আপনাকে কোনও উপদেশ দেব না। যুবক আমার হাতে দশটি টিকেল দিয়ে বল্‌লেন, বন্ধু আপনার পথে আপনি রওয়ানা হউন, পথে কোনও অনিষ্ট হবে না, ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করবেন।" যুবকের সংগে করমর্দ্দন করে ক্লাব হতে চলে এলাম। মিঃ অ্যাডিশ্যাম আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। তাঁর কাছে সকল কথা বল্‌লাম। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বল্‌লেন "সত্বরই এদেশে একটা বিদ্রোহ হবে বলে লোকের ধারণা, এই বিদ্রোহ হতে লোকের মন সরিয়ে নেবার জন্য শ্যাম দেশের শাসকশ্রেণী মিথ্যা সংবাদ সৃষ্টি করে লোককে ধাঁধায় ফেলছে, আসলে কিছুই হচ্ছে না বন্ধু, আপনি দু এক দিনের মধ্যে রওয়ানা হউন। কথাটা বুঝতে আমাকে একটু বেগ পেতে হ'ল। স্বাধীন দেশের লোক, বড় বড় বিষয় যত সহজে বুঝতে পারে

আমরা তা পারি না। শ্যাম দেশে বিদ্রোহ হবে বলে এসব মিথ্যা প্রচার হচ্ছে বলেই হউক আর ভিয়েতনামীদের অত্যাচার করার জন্যই হউক আসলে কিন্তু ইন্দোচীনে কিছুই হচ্ছিল না যখন বুঝলাম তখন ইন্দোচীনে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে উদ্‌যোগী হ'লাম।

যে লোকটা পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছে তার আবার রওয়ানা হবার প্রস্তুতি কি একথা সকলেই জিজ্ঞাসা করবে। একটি রাজধানীতে আসলে অনেক কিছু দেখার ও শুনবার থাকে। যে পর্যন্ত সেই বিষয়গুলি দেখবার এবং জানবার আগ্রহের পরিসমাপ্তি না হয় সে পর্যন্ত স্থান-ত্যাগের কথা ভাবতেই পারা যায় না। অ্যাডিশ্যাম আমাকে এক নূতন আলো দিয়েছিলেন। সেই নূতন আলোর সাহায্যে শ্যাম দেশের বুকের উপর দাঁড়িয়ে অনেক কিছু দেখতে পেরেছিলাম। যা দেখতে পেয়ে-ছিলাম এখানে তা বল্‌লে পুনরাবৃত্তি হবে কারণ স্বাধীন শ্যামদেশ নামক পুস্তকে তা বলা হয়েছে।

বেংকক পরিত্যাগ করে শ্যামের সীমান্ত গ্রাম অরণ্য প্রদেশে (অরণ্য প্রদেট) যেদিন পৌঁছলাম সেদিন অনবরত বৃষ্টি পড়ছিল। অনেকে বলেদিয়েছিল, গ্রামের বাইরে গ্রীকদের দ্বারা পরিচালিত একটি হোটেল আছে, সেখানে থাকলেই ভাল হবে, কিন্তু গ্রীক হোটেলে থাকবার সংস্থান আমার ছিল না। দ্বিতীয় কথা হ'ল, বেংককে থাকার সময়ই আমার মনে শ্বেতকায় বিদ্বেষের অংকুর গজিয়ে পত্রপুষ্পে শোভিত হয়েছিল, সেজন্যই গ্রীক হোটেলে যেতে ইচ্ছা হয় নি।

ইউরোপীয়ান্‌দের ঘৃণা করা কিন্তু আমার পক্ষে সমুহ অন্যায় হয়েছিল। ইহা আমার মনের দুর্বলতাকেই বড় করে দিয়েছিল। ইউরোপীয়ান্‌দের কি কি সদ্‌গুণ আছে তা বুঝবার ক্ষমতা আমার মন

হতে লোপ হয়েছিল। সুখের বিষয় চীন দেশে যাবার পর একজন ইংলিশম্যানেই আমার সেই দুর্বুদ্ধি দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বৃষ্টিতে ভিজা আর রৌদ্রে শুকানো আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজেও আমার কিছুই হয় নি। গ্রামের পাশে যেখানে পাকা রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে তারই পাশ দিয়ে বৃষ্টির জল প্রবল স্রোতে বয়ে চলছিল। সেই স্বচ্ছ জলে নানারূপ মাছ আনন্দে পাল বেঁধে চলছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল কিছু মাছ ধরি। কিন্তু মাছ ধরার অভিজ্ঞতার কথা মনে হতেই মাছ ধরা হতে বিরত হলাম। মাছের খেলা ভাল লাগে বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে মাছের খেলা দেখলাম। তারপর গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম।

দূর থেকেই দেখলাম এই গ্রামের গঠন অন্য ধরণের। শ্যাম দেশে এরূপ গ্রাম দেখেছি বলে মনে হল না। দুটি মাত্র লাইনে শ'খানেক ঘর। ঘরগুলিও যেন হাল্‌সেই তৈরী করা হয়েছে। অধিকাংশ অধিবাসীই খুনথাই আর বাকিগুলি চীনা। চীনারা ব্যবসা করে আর শ্যামরা চাষ আবাদ করে। গ্রামের মধ্যস্থলে যে ফাঁকা স্থানটুকু রয়েছে তাকে পথ অথবা উঠানও বলা চলে। আমি ফাঁকা জায়গাটুকুকে পথই বলব। পথটা কর্দ্দমাক্ত। অনেক চিন্তা করে দেখলাম এরূপ কর্দ্দমাক্ত স্থানে যদি সাইকেল নিয়ে যাই তবে সাইকেলটাকে আর নাড়তে পারব না। সেজন্য সাইকেলটা গ্রামের বাইরে রেখে গ্রামে প্রবেশ করলাম।

গ্রামে একখানা হোটেল ছিল তাতেই থাকবার বন্দোবস্ত করলাম। ঠিক হল দৈনিক দেড় টিকেল (প্রায় দুই টাকার সমান) রুমের ভাড়া দিতে হবে। রুমে সবই ছিল। পাশে একটি স্নানাগারও ছিল। রুমটি দেখে সুখী হয়েছিলাম। হোটেলের একটি বয়কে সংগে নিয়ে সাইকেল আনতে গেলাম। সাইকেল যথাস্থানেই পেলাম। এই

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

অঝুম বৃষ্টিতে কে যাবে আমার সাইকেল চুরি করতে? সাইকেল হোটেলের নীচ তলায় রেখে দিয়ে কুয়ার জলে বেশ করে স্নান করে নিয়ে গদি আঁটা শুভ্র ফেন-নিভ শয্যায় একটু বিশ্রাম করলাম এবং তারপরে পাশেরই রেঁস্তোরাতে কাফি এবং টোষ্ট খেয়ে রেঁস্তোরার মালিককে রাত্রে এসে ভাত খাব বলে চলে আসলাম।

সারাদিনের পরিশ্রম করার জন্য বিছানায় শুওয়া মাত্র ঘুম এল। কিন্তু কতক্ষণ যেতে না যেতেই ঘুম ভাংগল। চোখ খুলে দেখলাম এক জন খুনথাই আমারই রুমে চেয়ারে বসে আছেন। তিনি আমার সমবয়স্ক ছিলেন। আমার মুখ খুলার পূর্বেই তিনি আমাকে বল্‌লেন "আপনার পরিচয় আমি জানি। আমি হলাম এক জন পাইলট। এরোপ্লেন চালানোই আমার পেশা। তবুও এক জন পর্যটকের সংগে কথা বলে কিছু জানতে পারব এই আশা করে আপনার সংগে দেখা করতে এসেছি। আপনি কখন এলেন?" আমি বল্‌লাম "এই এক ঘণ্টা হবে, বড়ই পরিশ্রান্ত ছিলাম বলে বিছানাতে শোয়া মাত্র ঘুমে চোখ বুজিয়ে দিয়েছিল।" তারপর বল্‌লাম, "আপনার পরিচয় পেয়ে সুখী হলাম এখন বলুন ত আপনাদের দেশে যে বিদ্রোহ হবে তাতে আপনি অংশ নিবেন কি?" আমার প্রশ্ন শুনে পাইলট অফিসার চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ক্ষণ বিলম্ব না করে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি বিদ্রোহের গন্ধ কি করে পেলেন?" আমি বল্‌লাম "বন্ধু আমি পর্যটক শ্যাম দেশের ভাষা আমি ভাল করে জানি না। কিন্তু যে দেশের উপর দিয়ে যাই সে দেশের আভ্যন্তরিক রহস্য যদি। আপনি আমার কাছে না আসে তবে পর্যটক হয়ে লাভ কি? শুধু পেট ভরে খাওয়া আর ভিক্ষা করে বেড়ানোই যদি পর্যটকের পেশা হয় তবে সে পর্যটক পর্যটকই নয়। এখন বলুন আমার ধারণা সত্য কি মিথ্যা?" পাইলট

নতমুখে বল্‌লেন "আমি পলিটিক্স চর্চ্চা করতে আপনার কাছে আসিনি, অন্যান্য কথা শুনতে এসেছি।" বল্‌লাম "বেশ ভাল কথা তাই হ'ক পলিটিক বাদ দেওয়াই ভাল কথা, এতে অনেক সময় বিপরীত ফলও ফলে।"

হোটেলে কতকগুলি আল্‌জিরিয়ার লোকও ছিল। তারা আমার দরজার সামনা দিয়ে আসা যাওয়া করছিল। তাদের দেখিয়ে নবাগত ভদ্রলোক বল্‌লেন, "সীমান্তে প্রায়ই ডাকাতি হয় বলে এরা সীমান্ত অতিক্রম করতে পারছে না, ভেবে পাচ্ছি না, আপনি কি করে সাত মাইল লম্বা সীমান্ত অতিক্রম করবেন? বাস্তবিকই শ্যাম সরকারকে ঘুনে ধরেছে।" নবাগত ভদ্রলোকের কথার গতি পরিবর্ত্তন করার জন্য বল্‌লাম "আমি আগামী কল্যও এখানে থাকব, শরীরটা বেশ দুর্বল। এক দিন বিশ্রাম করলেই হবে, কি বলেন মিষ্টার?" নবাগত ভদ্রলোকের নাম জানতে চাইছিলাম। নাই ইয়ান্ তাঁর নাম বলছিলেন কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হচ্ছিল না, তবুও তাকে নাই ইয়ান্ ই বলব। নাই-ইয়ান্ আমার কথায় সায় দিয়ে বল্‌লেন "নিশ্চয়ই থাকবেন, আমারও আগামীকল্য কোন কাজ নাই, দুজনাতে গল্প করে সময় বেশ কাটবে।"

নাই ইয়ান্ যেই হউন আমার তাতে কিছু আসছিলওনা আর যাচ্ছিলওনা। কথা বলবার সংগী পাওয়া গেছে তাই যথেষ্ট। নাই ইয়ানের সংগে অনেক ক্ষণ বসে নানা কথা বলে রেঁস্তোরাতে গিয়ে খেতে বসলাম। সীমান্ত গ্রামের চাল চলন আলাদা। মস্তবড় একটা চীনা ডিসে করে ভাত, মাছ ভাজা, মাংস, বেকন ফ্রাই এবং সালাদ্ দেওয়া হয়েছিল। খাওয়া বেশ ভালই হল; কিন্তু চিন্তা করতেছিলাম বিলটার কথা। আমাকে পর্যটক ভেবেই হউক আর দয়াপরবশ

হয়েই হউক বিল যা দেওয়া হয়েছিল তা দেখে আমি ঘাবড়িয়ে যাইনি। আরামের সহিতই বিল পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমার সংগে যারা খেতে বসেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই শ্যাম দেশের সীমান্ত অফিসার এবং বাকি সব কয় জনই চীনা। চীনাদের মধ্যে কেহই দোকানদার ছিল না, সকলেই শিক্ষিত এবং ইন্দোচীন যাত্রী। এখান থেকে শ্রীস্বপন্ পর্যন্ত সপ্তাহে দুবার করে বাস্ যায়, এঁরা সকলেই বাসের অপেক্ষায় ছিলেন। ইন্দোচীন যাত্রীদের এক জনের সংগে আলাপ করে জানলাম, বাস চলাচলের ভার নিয়েছেন ইন্দোচীন গভর্ণমেন্ট অর্থাৎ ফরাসী সরকার। ফরাসী সরকারের নিয়ম কানুন বড়ই পাকাপোক্ত। পান্ থেকে চুন খসলে মাথা কাটার বন্দোবস্ত হয়। সেজন্যই চীনা ভদ্রলোকদের এই দুর্গতি।

নাই ইয়ান্ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হোটেলে ফিরে আসার পর তিনি আমার রুমে এসে শ্যাম দেশের স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। পর্যটকদের সকল বিষয়েই কিছু জানতে হয় কিন্তু কিছুতেই বাড়াবাড়ি করতে নাই একথা আমার জানা ছিল সেজন্য স্ত্রীলোকের কথা না বাড়িয়ে ঘুম পেয়েছে বলে পাইলট মহাশয়কে বিদায় করলাম। বাস্তবিক পক্ষে ক্রমেই লোকটার প্রতি আমার একটা ঘৃনার ভাব জেগে উঠছিল। কেন যে লোকটাকে ঘৃনা করতেছিলাম তা পরের দিন জানতে পেরেছিলাম। নাই ইয়ান ছিলেন শ্যাম দেশের গোয়েন্দা। শ্যাম দেশ থেকে আমায় বিদায় দেওয়াই ছিল তার ডিউটি। তিনি যে একজন গোয়েন্দা সেকথা হোটেলের মালিক আমাকে পরের দিন জানিয়ে দিয়েছিল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি গ্রামের উপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ে এত বৃষ্টি হয়েছিল যে ছোট ছোট নদী নালা ভর্তি

হয়ে গিয়ে গ্রামের উপর দিয়ে জল বইতে আরম্ভ করেছে। বাইরে যাওয়া অসম্ভব দেখে হোটেলে ফিরে এসে পুনরায় শুয়ে থাকলাম। নাই ইয়ানের ডাকাডাকি সত্বেও দরজা খুলে দিলাম না। এতে বোধহয় তার ভয় হয়েছিল। অবশেষে দ্বিতীয় বার যখন তিনি আমাকে ডাকলেন তখন আমি বিছানা ছাড়লাম এবং ঘরের বাইরে এসে প্রাকৃতি দুর্যোগ দেখতে লাগলাম। নাই ইয়ান কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন "কি দেখছেন?" বললাম, "মেঘের খেলা দেখছি। আমাদের দেশেও এরূপ বৃষ্টি হয়, এরূপ বৃষ্টিকে আমরা অঝুম বৃষ্টি বলি। এরূপ অঝুম বৃষ্টি আমাদের দেশে বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় আপনাদের এখানে একটু পরে হচ্ছে। আগামী কল্য যদি বৃষ্টি পড়া একটু বন্ধ হয় তবেই রওয়ানা হব।" নাই ইয়ান আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, "ভয় করবেন না, আমি আপনাকে সীমান্ত পার করে দিয়ে আসব।" নাই ইয়ানের দয়া দেখে আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং তিনি যে শ্যাম দেশের বেতন ভোগী চাকর তা বুঝতে আর বাকি থাকল না। এরূপ দয়া এবং বদান্যতা এই সর্বপ্রথম। পরে এরূপ দয়া আরও পেয়েছিলাম।

কম্বোজে প্রবেশ

সূর্য উঠে, সূর্য অস্ত যায়, এসব হল সাধারণ ঘটনা। এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না কিন্তু আজ সকাল বেলার সূর্য উঠার বিচিত্রতা অন্তত আমার কাছে বেশ ভাল লাগছিল। গত পনর দিন ক্রমাগত বৃষ্টি পড়েছে, তারপর আজ সূর্যের মুখ দেখে অন্তত পক্ষে অরণ্য প্রদেশের লোকের আনন্দ হয়েছে। আমার কিন্তু আর একটি আনন্দের কারণ ছিল। সিংগাপুরে চাকুরি করতাম, এবং মালয় দেশটাকে নিজের দেশই করে নিয়েছিলাম। সেই দেশটির সীমান্ত যে দিন পার হয়ে আসি সেদিন মনে এমন এক আনন্দের সূচনা হয়েছিল যা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার ছিল না। আজও সেরূপ ভাবেরই আনন্দ মন জুড়ে বসে ছিল। শ্যাম দেশ পার হয়ে এসেছি, আজ আর এক নূতন দেশে যাব। এটাকি কম আনন্দ? যাদের দেশ দেখার প্রবৃত্তি আছে তারাই শুধু সেই আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হবেন।

ঘুম থেকে উঠেই বাইরে এসে সূর্যকে প্রণাম করলাম, কত স্তুতি বাক্য মুখ থেকে আপনা হতেই বের হল; কারণ তখনও আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম, তখনও আমার মনে কুসংস্কার গুলি স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছিল তারপর সাইকেলটাকে একটু মুছে, রেঁস্তোরাতে গিয়ে কিছু খাবার খেয়ে পাশের ঘরে নাই ইয়ান্‌কে ডাকলাম। আমার ডাক শুনা মাত্র নাই ইয়ান বের হয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

এত সকালই কি আপনি রওয়ানা হবেন ?" "হাঁ বন্ধু, পর্যটক সকালই পথে বের হয়। এখনও হয়ত বন্য জীব তাদের বাসস্থানে যায় নি, এখনও হয়ত কতক গুলি হিংস্র জীবকে পথে দেখতে পাব, তা বলে কি আমাকে বসে থাকতে হবে। চলুন একটু নীচে যাই। আমার সাইকেলটা কাঁদার উপর নিয়ে যেতে বড়ই কষ্ট হবে, একটু সাহায্য করলেই আমি পথে বের হতে পারব।" নাই ইয়ান আর কথা না বলে কাপড় পড়ে নিলেন এবং আমার সংগে চল্লেন। সাইকেলটাকে আমরা পথের উপর দাঁড় করিয়ে আবার সাইকেলের কলকব্জা পরীক্ষা করলাম এবং সুন্দর পথের উপর দুজনায় হাটতে আরম্ভ করলাম। কতক্ষণ যাবার পরই নাই. ইয়ান্ বল্লেন, "এর বেশি আর যাব না— আপনি আজীবন বাঁ দিকে পথ চলেছেন এখন হতে ডান দিকে পথ চলবেন। এতে যেন ভুল না হয়। যদি ভুল করেন তবে মৃত্যু অনিবার্য। Always keep to your right in Indochina. এখন আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, এটা কিন্তু আমাদের রাজ্যের ভেতর নয়। এটা হল ফরাসীদের। এখন থেকেই আপনি ডান দিকে চলতে আরম্ভ করুন। নাই ইয়ানের কথা মত সড়কের ডান দিকে চলে গেলাম এবং নাই ইয়ানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেল পূর্ণ বেগে চালিয়ে দিলাম।

একটু যাবার পরই দেখলাম একটি সাইন বোর্ডে লিখা রয়েছে "keep to the right" "Virrage" ভিরেজ শব্দটির অর্থ বুঝতে পারলাম না এবং শব্দটির অর্থ বুঝবার দরকারও মনে করলাম না। ডাইনে এবং বাঁয়ে গভীর বন। বন যেমন গভীর বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ তেমনি রাস্তার দুদিকে জলও কানায় কানায় ভর্তি হয়ে রয়েছিল। কোথাও পথের উপর দিয়ে জল বয়ে চলছিল। মাছে সর্বত্রই কিলবিল করছিল। কই,

মাগুর পথের উপর দিয়ে চলছিল। পুঁটি এবং খলিসা ছোট ছোট নালা দিয়ে রাস্তার উপরই চলছিল। ডুরাসাপ পুঁটি মাছ ধরবার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। মানুষের ভয়ে ডোরা সাপগুলি জলে ডুব দিচ্ছিল, কই মাগুর তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, পুটি এবং খলিসা মাছগুলি কিন্তু আমাকে একটুও ভয় করছিল না। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম কতকগুলি শিয়াল একটা ছোট হরিণ শিশুকে সবে মাত্র হত্যা করেছে এবং চারিদিকে ঘেরাও করে হরিণের মাংস আনন্দে খাচ্ছে। আমাকে দেখে তারা একটুও ভয় পেল না।

ইত্যবসরে পুবের সূর্য মেঘের আড়ালে ডুব দিল। সকালে সন্ধ্যার লক্ষণ দেখা দিল। ক্রমে মেঘমালা যখন সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেল্‌ল তখন সাইকেল হতে নেমে চোখ হতে চশ্‌মা খুলে যত্নের সহিত কেস্‌টাতে রেখে দিয়ে এগিয়ে চল্‌লাম। কতক্ষণ পরই দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড ঘর। ঘরের পাশ দিয়েই রাস্তা চলেছে। ঘরের পাশে পৌঁছার পর কতকগুলি লোক আমাকে থামালে। সাইকেল হতে নেমে দরজার সামনে দাঁড়ালাম। একজন ফ্রেন্‌চম্যান এসে ফরাসী ভাষায় কি বল্‌ল! ইংলিশে বল্‌লাম, "মশাই শুধু ইংলিশ ভাষাই শিখেছি, তোমাদের ভাষা শিখিনি।" লোকটি তখন ইংলিশে বললে "তাই ত, বড়ই মুস্কিল, পাসপোর্ট দিন, মঁশিয়ে।" তার হাতে পাসপোর্ট দিলাম। পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে বললে সাড়ে সাত টিকেল দিতে হবে। টাকার কথাটা শুনে বড়ই রাগ হল, কিন্তু রাগ চেপে রেখে বললাম "আপনাদের কন্‌সাল ত টাকার কথা বলেন নি, তিনি বলেছিলেন পথে চোর ডাকাত আছে টাকা সংগে না রাখাই ভাল।" লোকটা উগ্রমূর্তি ধারণ করে বললে, "এসব বাজে কথা আমি শুনব না, হয় টাকা দিন নতুবা আমি আপনাকে এরেস্ট করে সিংগাপুর পাঠিয়ে দেব।" অফিসারের কথায়

সারমর্ম হল যদি আমি সাড়ে সাত টিকেল দিতে না পারি তবে সে আমাকে এরেস্ট করে সাইগনে পাঠাবে এবং সেখান থেকে জাহাজে করে সিংগাপুরে ঘরের ঠাকুরকে ঘরে পাঠানো হবে। সুখের বিষয় আমার সংগে দশটি টিকেল ছিল। তৎক্ষণাৎ সেই দশ টিকেলের নোটখানা স্টকিংএর ভাঁজের ভেতর থেকে বের করে দিয়ে বল্লাম, "এই নিন আপনাদের টেক্স, জানতে পারি কি কিসের জন্য এই টাকাটা নেওয়া হল?" "টাকাটা কেন নেওয়া হল তা বলতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। চার টিকেল নেওয়া হল পোল্ ট্যাক্স আর সাড়ে তিন টাকল হ'ল এদেশে প্রবেশ ফি।" অফিসার বাকি টাকা আমাকে ফেরত দিলেন এবং বল্লেন "সত্বরই বৃষ্টি আরম্ভ হবে, আপনি কি আজই শ্রীস্বপন যাবেন?" "হ্যাঁ মঁশিয়ে, রৌদ্র বৃষ্টিকে ভয় করলে চলবে না, এখনই রওয়ানা হচ্ছি।" এই বলেই সাইকেলে উঠে সামনের পথ ধরে এগিয়ে চল্লাম।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। এবার বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। বারিপাত ক্রমেই বাড়তে লাগল। পশ্চিম দিক হতে প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল। এতে আমার বেশ সুবিধা হল। সাইকেল স্বল্পায়াসে চালাচ্ছিলাম। মাইল পাঁচেক যাবার পর পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটি লোক আমার পেছন আসছে। লোকটা জাতে কম্বোজ। কাস্টম অফিসারের ঘরের কাছে ক'টা কম্বোজ যুবকের সংগে কথা হয়েছিল। এদের কথার ধরণ ভারতের দেশীয় রাজাদের প্রজার মতই। এদের দায়িত্ব জ্ঞান নাই বল্লেও চলে। হুজুরের হুকুম প্রতিপালন করাই যেন তাদের একমাত্র কাজ। এই শ্রেণীর লোকের কিন্তু সাধারণ জ্ঞানও থাকে না। মনে হচ্ছিল—যেন লোকটা আমার পেছন নিয়েছে। এরা না করতে পারে এমন কাজ নাই। লোকটাকে পেছনে ফেলে আরও এগিয়ে যাবার জন্য

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

সাইকেলের বেগ একটু বাড়িয়ে দিলাম। সাইকেল ঘণ্টায় আট মাইল বেগে এক ঘণ্টা যাবার পরই তাকে প্রায় তের মাইল পেছনে রেখে একটি বিশ্রামাগারে গিয়ে উঠলাম।

শ্যাম এবং কম্বোজে ঘাটে মাঠে সর্বত্র পথিকের জন্য বিশ্রামাগার তৈরী করে রাখা হয়। এই বিশ্রামাগারগুলির দেওয়াল থাকে না। যে সকল স্থানে জলাভাব সেই সকল স্থানে পাতকুপের ও ব্যবস্থা থাকে। বিশ্রামাগারে গিয়ে একটি পথিকের সংগে দেখা হল। লোকটি দরিদ্র। ছিন্ন বস্ত্রে আবৃত হয়ে সে শীতে কাঁপছিল। একটা দেশী সিগারেট ধরাবার জন্য সে চকমকি পাথরের সাহায্য নিচ্ছিল। লোকটির প্রতি আমার দয়া হয়েছিল—সেজন্য আমার যত্নে রক্ষিত সিগারেটের কৌটা থেকে একটি সিগারেট দিয়ে চকমকি পাথরে আগুন ধরাতে বললাম। আমার কাছেও দেশলাই ছিল, কিন্তু কখনও চকমকি পাথরের ব্যবহার দেখিনি বলে চকমকি পাথর দিয়ে সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা হল। লোকটি অতিকষ্টে চকমকি পাথরের সাহায্যে নেকড়াতে আগুন ধরিয়ে আমার দেওয়া সিগারেটটি ধরাল। আমিও একটি সিগারেট ধরিয়ে বসে আরাম বোধ করতে লাগলাম। লোকটির হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছিল—সে আমাকে পুলিশ বলেই গ্রহণ করেছে। তার ভুল ধারণা অপসারণ করার জন্য, শ্যাম এবং মালয় ভাষায় মিলিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলাম, "আমি পুলিশ নই মামুলি পথিক মাত্র। লোকটির কিন্তু বিশ্বাস হয় নি সে আমাকে পরিত্যাগ করাই ভাল মনে করছিল কিন্তু বৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায় তার পক্ষে স্থান ত্যাগ করা যেমন সম্ভব হচ্ছিল না আমার পক্ষেও স্থান ত্যাগ করা একটু কষ্ট করছিল কারণ বৃষ্টির সংগে অনবরত বজ্রপাত হচ্ছিল।

যে লোকটা আমার অনুসরণ করছিল ঘণ্টা দেড়েক পরে এসে

উপস্থিত হল এবং সবিনয়ে "নমস্কান্" নমস্কার জানিয়ে আমারই পাশে বসল। আমি তাকে সিগারেট দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। সে নিজের পকেট হাতড়িয়ে যখন সিগারেট পেল না তখন আমার কাছে একটি সিগারেট চাইল। তাকে একটি সিগারেট দিয়ে বজ্রপাত নিবৃত্তির অপেক্ষায় রইলাম।

ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আকাশ একটু পরিষ্কার হল। কাউকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে পথে আসলাম এবং চলতে আরম্ভ করলাম। বের হবার সংগে সংগেই পশ্চাৎ অনুসরণকারী লোকটা বের হয়ে আসল এবং বহু পরিশ্রম করে আমার কাছে এসে বল্ল—"নাই" মানে মিষ্টার, "আমি পুলিশের লোক, আপনার সাহায্যার্থে সংগ নিয়েছি। পথে ডাকাতের ভয় আছে। বিষয়টা বোধ হয় আপনি অবগত আছেন?" শ্যাম দেশের শাসক শ্রেণীর মিথ্যা প্রপোগেণ্ডার কথা পুলিশটাকে বল্লাম না, শুধু জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি যে পুলিশের লোক তার প্রমাণ কি? সে তৎক্ষণাৎ তার পকেট হতে দুটা পিস্তল বের করে দেখিয়ে বল্ল—যদি দরকার হয় তবে আপনাকে একটা দেব এবং উভয়ে মিলে প্রাণ রক্ষা করব। শ্যাম দেশে অস্ত্রের লাইসেন্স আছে বটে কিন্তু আমাদের দেশের মত লাইসেন্স পাওয়া তত শক্ত নয়। যার ইচ্ছা সেই পিস্তল অথবা বন্দুক কিনে নিজের কাছে রাখতে পারে। তবুও লোকটিকে কম্বোজ সরকার অর্থাৎ ফরাসীদের গোলাম রূপে গণ্য করে নিয়ে বল্লাম, "আচ্ছা তুমি আমার সংগে চলতে পার"।

দ্বিপ্রহরের পর থেকে বৃষ্টি কয়েক ঘন্টার জন্য থামল। আমরাও সময়ের সদ্ব্যবহার করে শ্রীস্বপণ পৌছবার জন্য প্রাণপণে চলতে লাগলাম। পথে দুবার বিশ্রাম করে খাবার খেয়েছিলাম এবং একবার মাছের খেলা দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

স্বপন পৌঁছবার আধঘন্টা পূর্ব্ব থেকে ইচ্ছা করেই পুলিশটা পিছয়ে চলতেছিল। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে আর ডাকলাম না, প্রবলবেগে সাইকেল চালিয়ে গ্রামে পৌঁছবার চেষ্টা করলাম। এদিকে বৃষ্টিও আগত প্রায়। গ্রামে পৌঁছার সংগে সংগেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমিও প্রবলবেগে সাইকেল চালিয়ে পথের পাশে অবস্থিত একটি রেস্তোরায় গিয়ে উঠলাম। এই রেস্তোরাটি শুধু ফ্রেন্‌চদের জন্য সেকথা আমার জানা ছিল না। একজন ফ্রেন্‌চম্যান সেখানে বসে কাফি খাচ্ছিল এবং আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে আশ্চর্য্য অনুভব করছিল। তারপর একখানা চেয়ারে বসে যখন সিগারেট ফুকতে ছিলাম তখন সে বোধ হয় আরও অবাক হয়েছিল।

এরূপ আশ্চর্য্য অনুভব করার কারণ ছিল। কম্বোজরা কখনও ফ্রেন্‌চদের সামনে চেয়ারে বসে না অথবা এক টেবিলে বসে খাবারও খায় না, তার একমাত্র কারণ হল—যারা তাদের রাজার সংগে বসে খায়, তাদের রাজাকে যখন ইচ্ছা তখন বিতাড়িত করতে পারে তারা নিশ্চয়ই পুজনীয়, এই যে দারুণ অধঃপাতী ভাব, সেই ভাবের প্রভাবেই কম্বোজরা পূবেও দেবে রয়েছিল. এবং দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ও তারা বয় বাবুরচির কাজ করেই সন্তুষ্ট ছিল। তারা যেমন ভয় করে চলত ফরাসীদের তেমনি ভয়ের সহিত সম্মান করত জাপানীদের অথচ শ্যাম এবং কম্বোজ একই জাত, একই ধর্ম, একই ভাষা। সামান্য একটু প্রভেদ ছিল, শ্যামের রাজা ছিলেন স্বাধীন আর কম্বোজের রাজা আমাদের দেশের দেশীয় রাজাদের মত দাসানুদাস।

বয়কে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখানে এক পেয়ালা কাফির দাম আমাদের বারো আনার মত। তত অর্থ আমার ছিল না সেজন্য

ব্যাক না খেয়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হলাম। বৃষ্টি ও আরম্ভ হল। শরীরের গরমে সার্টটা শুকিয়েছিল বৃষ্টিতে আবার ভিজে গেল।

পথের পাশেই পোষ্ট-অফিস। সেখানে এসে দাঁড়ালাম এবং অটো-গ্রাফ বইটাতে পোষ্ট মাষ্টারের দস্তখত নেবার জন্য অফিস ঘরে প্রবেশ করলাম। দু সেণ্টের একখানা স্টাম্প কিনে অটোগ্রাফ বইটার একটি পাতায় লাগিয়ে পোষ্ট অপিসের সিলমোহর করে দিতে বললাম। পোষ্ট-মাষ্টার আমার অনুরোধ বিনাবাক্যব্যয়ে রক্ষা করলেন এবং চুপ করে থাকলেন। পোষ্টমাষ্টার জাতে আনামিত এবং উত্তর ভিয়েত নামের বাসিন্দা। পোষ্টমাষ্টারের কাছে একখানা পরিচয় পত্র দিলাম, তাতে শ্যাম, চীনা এবং ইংলিশ ভাষায় আমার পরিচয় লিখা ছিল। দেখলাম, পোষ্টমাষ্টার ইংলিশ ভাষায় লিখিত পরিচয় অংশেই মনোনিবেশ করেছেন। ভাবলাম হয়ত পোষ্টমাষ্টার ইংলিশ জানেন কিন্তু যখন ইংলিশ ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলাম তখন তিনি মুখ বন্ধ করে আমার হাতে কুড়িটি সেন্ট দিয়ে বিদায় দিলেন। তখনও বুঝতে পারিনি এরূপ ভাবে বিদায় দেবার কারণ কি?

পোষ্টাফিসে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ভাল লাগল না। গ্রামে আসলাম। গ্রামে মাত্র দুইখানা চীনা খাবারের দোকান ছিল। ইচ্ছা হল একটি দোকানে বসে বিশ্রাম করি কিন্তু তাও হল না। চীনা খাবারের দোকানের মালিক ঘরে উঠতে দিল না। ভারতবাসীকে চীনারা অস্পৃশ্য মনে করে না। আমার শরীর বৃষ্টির জলে ভিজা ছিল যদি আমি তার ঘরের বারান্দায় উঠতাম তবে কিছুটা জল পরতই। বারান্দা ভিজে যাবে বলেই বারান্দায় উঠতে দেয়নি। নিরুপায় হয়ে নিকটস্থ একটি গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এবার ভাগ্যে আরও দুর্ভোগ রয়েছে তা আপন মনে ভাবছিলাম। তখন আমি ভাগ্যকে

বিশ্বাস করতাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর বেশ ঘুমও পেল। কি আর করব, সকল দুঃখ নীরবে সহ্য করব বলে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা উপর হাত রেখে চোখ বুঝলাম্।

আরও কতক্ষণ পরে একটি চীনা ছেলে এসে আমায় ডাকলে। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। সে এসেই বল্লে—"তোর যাবার কোথাও বুঝি স্থান নেই, চল্ আমার সংগে, আমার ঘরে আমি থাকতে এবং খেতে দিব।" ছেলেটির কথায় আশ্বস্ত হয়ে তার সংগে চললাম্। বেশি দূর যেতে হল না। যে ঘরের বারান্দায় উঠতে দেওয়া হয়নি, সেই ঘরেই গিয়েই উঠলাম্। ছেলেটি জানালে এই খাবারের দোকানেই মালিক চার-পেশো (ছয়টাকা) বেতনে সে কাজ করে। ছয় টাকা মাইনের চাকরের প্রভাব দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম! এ সম্বন্ধে তাকে কিছুই না বলে সাইকেলটা টেনে নিয়ে গিয়ে তার ঘরে ঢুকলাম, ছেলেটি আমাকে বলল "তোর যদি ইচ্ছা হয় তবে পাতকুপের জলে স্নান্ কর, আমি এক পেয়ালা কাফি এনে দিচ্ছি।" স্নান করার জন্যে পাতকুপের দিকে না গিয়ে, ছেলেটির সংগে দোকানের মালিক কি ব্যবহার করে তা দেখার জন্যে চেয়ে থাক্লাম্। দেখলাম্ দোকানের মালিক ছেলেটিকে বেশ সমীহ করে চলছে এবং নিজেই আমার জন্যে কাফি তৈরী করছে। শুধু তাই নয়, দোকানীর স্ত্রী আমার জন্য মাছের তরকারী তৈরী করার জন্য একটা কড়াইকে আগুনে উপুর করে ধরে রাখছে। তাদের ধারণা ছিল আমি ধর্মে মুসলমান। মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা কখনও চীনাদের ঘরে খায় না, তার একমাত্র কারণ হল চীনারা শূকর মাংস ছাড়া কোন মতেই দিন কাটাতে পারে না।

স্নান করে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করলাম তারপর কাফি খেয়ে ঘরে গিয়ে

শুয়ে থাকব ভাবছি এমন সময় গৃহিনী এসে বললেন, যদি আমার ইচ্ছা হয় তবে পাক করে খেতে পারি। গৃহিনীকে জানালাম পাক করে খাবার অভ্যাস নেই, এতে গৃহিনী সুখী হলেন এবং নিজেই শুক্‌না মাছের ঝোল এবং শুক্‌না মাছ ভাজা করে দিলেন। খেয়ে গিয়ে শুইব এমন সময় আস্‌ল একজন কম্বোজ দারোগা। সে এসেই আমাকে ধমকাতে আরম্ভ করল। তার ধমক আর সহ্য হল না, তাকে বললাম, "এখান থেকে বেরিয়ে যাও নতুবা সুবিধা হবে না।" লোকটা আমার কথা বুঝল এবং স্থান ত্যাগ করল। বুঝলাম এরও ধাক্কা আমাকে সামলাতে হবে। শুয়ে থাকা ভাল মনে করলাম না। কতক্ষণ পরই একজন ভদ্রবেশী কম্বোজ এসে আমার সংগে বিশুদ্ধ ইংলিশ ভাষায় 'প্রেমালাপ' জমালেন। তখন কথা বলতে বেশ ভালবাসতাম তা যে রকমেরই হউক। অনেকক্ষণ কথা বলে শেষটায় ভদ্রবেশী কম্বোজ বল্‌লেন, "আপনাকে পুলিশ ষ্টেশনে (সুরাতী) যেতে হবে, দয়া করে চলুন।" আমি বল্‌লাম, "হাঁ পথে আসুন, কম্বোজদের ধমকিয়ে, অত্যাচার করে আপনাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে, আমার সংগে সেরূপ ব্যবহার চলবে না, আর কিছু আমরা না পারি, সত্যাগ্রহ করা শিখেছি। চলুন, 'মহাত্মা গান্ধিকী জয়।"

তখনকার দিনে ইন্দোচীনে সত্যাগ্রহ এবং মহাত্মা গান্ধির কার্য-কলাপ নিয়ে সাধারণ লোকও আলোচনা করত। ভদ্রবেশী কম্বোজ মহাত্মা গান্ধির নাম শুনে কেঁপে উঠল। আমরা পুলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম। ফরাসী পুলিশ অফিসার জাগ্রতই ছিলেন। আমার আসার সংবাদ পেয়ে অফিসে আসলেন। ইংলিশ প্রথামতে আমি তাকে "গুড্ আপ্‌টার নূন" বল্‌লাম। তিনি আমাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। আমি তাতেই বস্‌লাম, দারগা এবং ভদ্রবেশী কম্বোজ দাঁড়িয়ে

ছিল। দারোগা রাগে কড়মড় করছিল—ভাবছিল অ'ফসার হয়ত আমাকে বলতে না বলে বেদম প্রহার করবে। কিন্তু তা হল না। আমি অফিসারকে বললাম, নেটিভ্ অফিসার এখনও ভদ্রতা কাকে বলে শিখেনি এবং আমার এখানে গিয়ে যে প্রকার লম্ফঝম্ফ করছিল তারও কতকটা আভাস দিলাম। অফিসার দুঃখ করে বললেন, "নেটিভ অফিসারদের দস্তুরই তাই, যদি বলি ডেকে নিয়ে এস তবে তারা বেঁধে নিয়ে আসে। এসব অশিষ্ট কাজের জন্য আমরা দায়ী নই। দায়ী ওদের সভ্যতা।" ভেবে দেখলাম যদি এসম্বন্ধে কথা বাড়াই তবে থু থু নিজের উপরই এসে পড়বে। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, "এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন ?" তাকে যখন বল্লাম, বাটাংবং যাবার ইচ্ছা আছে তখন তিনি বল্লেন, "সাইকেলে এখন বাটাংবং যাওয়া চলবে না। পথের উপর এক হাঁটু জল জমা হয়ে রয়েছে। এখানে কয়েকদিন অপেক্ষা করুন তারপর যাবেন।" এর পরেই পাসপোর্টের নম্বর ইত্যাদি নিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। আমিও খাবারের দোকানে এসে শুয়ে থাকলাম।

বিদ্রোহীর সংস্পর্শে

সেদিন বিকাল বেলা আরও বৃষ্টি হল। ঘর থেকে বের হবার ইচ্ছা হল না। রাত্রে আমার সাহায্যকারী ছেলেটির দেখা না পেয়ে চিন্তিত হলাম। ভাবলাম, সে কোথায় গিয়ে শুয়েছে কে জানে। পরের দিন সকাল বেলা বৃষ্টিতে ভিজেই পাশের কয়টি দোকানে পরিচিত হবার চেষ্টা করলাম। দোকানীরা সকলেই অর্দ্ধ কম্বোজ কারো চীনা মা আর

কারো চীনা বাবা। সকলেই মালয় ভাষায় কথা বলতে পারে। এদের সংগে কথা বলে চা খেয়ে বুঝলাম এখানে কতকগুলি লোক আছে যারা হয়ত আমাকে আজই ডাকবে। যে ছেলেটি আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুইতে দিয়েছে এবং খাবারের বন্দোবস্ত করেছে সে তাদেরই একজন। দোকানীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কেহ এক পেছ কেহ দুই পেছ দিয়ে সাহায্য করছিল।

ভাবছিলাম দোকানীকে খাবারের দাম দিয়ে দিব, কিন্তু দোকানী খাবারের দাম নিল না উপরন্তু ইংগিতে বুঝিয়ে দিল আমি যে খাবারের দাম দিতে যাচ্ছিলাম সে কথা যেন তার ছয় টাকার চাকর না জানতে পারে।

বিকালে পশ্চিমের সূর্য্যের দেখা পাওয়া গেল। রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম্। চীনা ছেলেটি আমার হাত ধরে গ্রামের বাইরে রওয়ানা হল। গ্রাম্য পথ পাথরের। পথ চলতে একটুও অসুবিধা হল না। আধমাইল যাওয়ার পর একটি বোর্ডিং হাউস দেখতে পেলাম। এখানে চীনা এবং আনামিতরা থাকে। ঘরের পাশেই কতকগুলি জমি। এই জমিতেই তারা চাষ আবাদ করে এবং চাষের মজুরের মত জীবন কাটায়। অবসর সময়ে নানারূপ খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমার উপস্থিতিতে সকলেই আনন্দিত হল। চা তৈরী হল। চায়ের টেবিলে বসে নানারূপ কথা আরম্ভ হল। দুঃখের বিষয় তখনও আমি উন্নত ধরণের কথা বলতে জানতাম না। তখন ছিল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ। ভারতের ক'জন লোক তখন বলসেভিজম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল? সিংগাপুর-ত তখন অর্থ উপার্জ্জনেরই স্থান ছিল মাত্র। তবুও সিংগাপুরে কতকগুলি চীনা যুবকের সংস্পর্শে এবং নোয়াখালি নিবাসী গৌরীশচন্দ্র সিংহ

রায়ের দয়ায় বলসেভিজমের ভ্রম্ ও ভয় অনেকটা অপসরণ হয়েছিল। এদের কাছে এসেই আজ সর্বপ্রথম বলসেভিজমের কথা শুন্‌নাম। এরা হল আনাম এবং চীন দেশের কতকগুলি প্রগতিশীল পলাতক্।

আনামরা সকল সময়েই স্বাধীনতাপ্রিয়। তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদ্রোহ আরম্ভ করে ১৮৮২ সালে। তাদের জাতীয়ভাব এবং স্বাধীনতা বোধ একই সংগে জাগ্রত হয়। প্রথম প্রথম তারা বিদ্রোহ করত। বিদ্রোহে সকলে যোগ দিত না। তবুও ফরাসী সরকার বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার ভান করে গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করতে কসুর করত না। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হতে তারা বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে, এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় গণ-জাগরণের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে বদ্ধ পরিকর হয়। গণ-জাগরণের কাজে শুধু কোচীন চীনা আনাম এবং তংকিনের যুবকরাই যোগ দিয়েছিল। কম্বোজ এবং লোয়াস প্রদেশের লোক এরূপ বৈজ্ঞানিক ধরণের গণ-আন্দোলন মোটেই পছন্দ করত না। রাজভক্তি এবং ধর্মের মোহ এই দুই প্রদেশের লোককে গণ-জাগরণ হতে বিরত রেখেছিল। যাতে কম্বোজ এবং লোয়াসরা গণ-আন্দোলন হতে বাদ না যায় সেজন্য আনামিতরা কম্বোজ এবং লোয়াসের নানা স্থানে ঘাঁটি করে। আমাকে যেখানে ডেকে নেওয়া হয়েছিল সে স্থানটাও তারই একটি।

বোর্ডিং হাউসের-সভ্যরা ঠিক করলেন আগামী কল্য একখানা মোটর ট্রাক ভাড়া করে আমাকে নিয়ে তাঁরা আংকোর-ওয়াট দেখতে যাবেন। তাদের প্রস্তাবে বড়ই আনন্দিত হলাম। তখনও আমার মন্দির দেখায় উৎসাহ ছিল। সেজন্য তখনকার দৃষ্টিভংগিও অন্য ভাবের ছিল। বোর্ডারদের সংগে অনেক রাত্র পর্যন্ত কথা বলে একটা ছোট্ট পথ ধরে ঘরে ফিরতে হয়েছিল। এই বোর্ডিং হাউসের

চাষীদের অনেকেই নানাভাবে সন্দেহ করত। বোর্ডারদের কাছ থেকে শুনলাম ইন্দোচীনে ইংলিশ ভাষা শিক্ষা করা শুধু নিন্দনীয় নয়, পরোক্ষভাবে আইন বিরুদ্ধ ছিল। এর কারণ জিজ্ঞাসা করে অবগত হলাম অনেক কথাই কিন্তু এই অনেক কথার শেষ কথা হল, চীন দেশ থেকে ইংলিশ ভাষায় প্রকাশিত মার্কসইজমের অনেক বই ইন্দোচীনে আসত। ফ্রেন্চ ভাষায় প্রকাশিত কোন প্রগতিশীল সাহিত্য ইন্দোচীনে আসত না। সেজন্যই আনামিতরা যাতে ইংলিশ ভাষা না শিখতে পারে তারই প্রতিবন্ধ অপ্রকাশ্যে করা হত।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরী হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখি ভদ্রপুলিশ মহাশয় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাকে জানিয়ে দিলাম, আজই আংকোর ওয়াট দেখার জন্য রওয়ানা হব। লরী ভাড়া হয়েছে। কয়েকজন দোভাষীও আমার সংগে যাবে। আংকোর ওয়াট দেখায় আমার প্রবল ইচ্ছা রয়েছে। পুলিশ আমার কথায় সন্তুষ্ট হল, কারণ তখনকার দিনে যারাই ধর্মচর্চায় সময় কাটাত তাদের কোনও দেশের পুলিশ বিপদে ফেলত না।

বেলা দশটার সময় লরী এল। লরীর সামনের সিটে বসলাম। গাড়ি চালিয়ে দিল। কয়েকঘন্টা ধরে আমাদের উচু ভূমির উপর দিয়ে চলতে হয়েছিল তারপরই সমতল ভূমি। পথের দুপাশে যে সকল গ্রাম দেখতে পেলাম তার অধিবাসী সকলেই কম্বোজ। বড়ই দুরবস্থায় এদের দিনপাত হচ্ছে। তাদের জমির রক্ষণাবেক্ষণ হতে আরম্ভ করে চাষ আবাদ তারাই করে কিন্তু ফসল হলে পরে সরকারের লোক এসে সামান্য মূল্যে ধান কিনে নিয়ে যায়। সাধারণ লোক কিন্তু এতে মোটেই দুঃখিত নয়। তারা ভাবে, রাজা তাদের নিজের লোক, তিনি কি তাদের প্রতি জুলুম করতে পারেন? অথচ শ্যাম দেশে জমির কোনও

খাজনাই ছিল না। যে জমি চাষ করল সেই ফসল ঘরে উঠাল। শ্যামরা জমির খাজনা দেয় না। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষরা বৎসরে চার টিকেল টেক্স দেয়। কম্বোজরাও চার টিকেল (তিন পেন্স) টেক্স দেয় তবুও তাদের জমির খাজনা দিতে হয় এবং অল্প মূল্যে শস্য বিক্রি করতে হয়। আমার সাথীরা মাঝে মাঝে লরী থামিয়ে সেই সংবাদগুলিই আমাকে দিচ্ছিলেন।

তিনটার সময় আমরা এক চীনা ভদ্রলোকের বাড়ীতে পৌঁছলাম। সাথীরা আমাকে চীনা ভদ্রলোকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েই সরে পড়ল। চীনা ভদ্রলোক থাকার এবং খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। সেদিন নিকটস্থ গ্রামগুলি দেখলাম। গ্রামের বাসিন্দা সকলেই কম্বোজ। গ্রাম দেখে মনে হয় না, এদের পূর্বপুরুষ আংকোরওয়াট তৈরী করেছিলেন।

পরের দিন সকাল বেলা আংকোর ওয়াটের দিকে রওয়ানা হলাম। যে পথ ধরে চলছিলাম তা বড়ই ভয়াবহ। পথে বিষধর সর্প প্রা ই দেখা যায়। পরিত্যক্ত পাথরের বাড়ীতে সাপ থাকতে বেশ ভালবাসে। আংকোর ওয়াটের একপাশে কয়জন ফ্রেন্চ্-ম্যান্ থাকেন। তাঁরা আংকোর ওয়াটের চিত্র বিক্রি করেন এবং ওয়াট সম্বন্ধে নানা তথ্য লোকের কাছে বলেন। তাঁদের কাছ থেকে আংকোর ওয়াটের ছবি কিন্তে বলেন। তাদের কাছ থেকে ছবি কিনলাম কিন্তু কথা শুনলাম না, কারণ তারা আমার কাছে কি বলবেন? সামনেই যা দেখছি তাতেই আমি আনন্দ পাচ্ছিলাম। ওরা বরং কথা বলে আমাকে দিশেহারা করে তুলছিলেন।

ওয়াট মানে বিহার। বৌদ্ধ যুগে এই বিহার তৈরী হয়েছিল। তাতে একদিকে যেমন অস্ট্রীক সভ্যতার ড্রেগণ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

বৌদ্ধযুগের পরেও দেবদেবীরও অভাব ছিল না। গণেশের মূর্তির ছড়া-ছড়ি সর্বত্র। ধ্যান-মগ্ন বুদ্ধদেবের নানারূপ মূর্তি। এসব ত আছেই, উপরন্তু বড় বড় পাথরের উপর এমনি সুন্দর ভাবে ড্রেগণ অংকিত করা হয়েছে, যা দেখলে মনে হয় সত্যিই এক টুক্‌রা প্রাকৃতিক পাথরের উপর কারুকার্য্য করা হয়েছে। আংকোর ওয়াট দেখতে বেশিক্ষণ লাগল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এসে নূতন একটি ওয়াটে গিয়ে দেখি কয়েক জন সন্ন্যাসী বাঁশ দিয়ে নানারূপ কারুকার্য-খচিত জিনিস তৈরী করছেন। অবসর সময়ে এসব কাজ করেই তাদের সময় কাটে।

এই সন্ন্যাসীদের ধারণা যতক্ষণ তাদের পরণে গৈরিক বস্ত্র থাকবে ততক্ষণ তারা কামিনী কান্‌চণ হতে দূরে থাকবেন। এই দুটি হতে দূরে থাকতে হলে মনকে কার্যে নিয়োজিত রাখা দরকার। কাজ অনবরত করতে হয় নতুবা মন আপনা হতেই সংসারে চলে আসে। সন্ন্যাসীদের মুখ থেকেই শুন্‌লাম, এই যে এত বড় মন্দির দেখা যাচ্ছে তার সবটাই সন্ন্যাসীদের দ্বারা প্রস্তুত। এই সন্ন্যাসীরা যদি এত বড় কারুকার্য্য-খচিত ওয়াট তৈরী না করে সমাজ গঠনে মন দিতেন, তবে আজ এই দেশে বিদেশী এসে রাজত্ব করতে পারত না।

আমাদের দেশে বলা হয় ধ্যান ধারণায় সময় কাটানো উচিত, ধ্যানটা কিসের হবে, আর ধারণা কি করতে হবে? যাকগে এসব কথা না বলাই ভাল। তবুও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে সমাজ গঠনের দিকে দৃষ্টি আছে বলে মনে হয়, আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা শুধু আশীর্ব্বাদ করেই ভূরিভোজন পেয়ে থাকে।

আংকোর ওয়াট দেখে যখন চীনা ভদ্রলোকের ঘরে ফেরলাম তখন অনেকগুলি পুলিশ অন্যান্য যাত্রী নিয়ে বসছিল। তারা আমাকে নানা প্রশ্ন করল। এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে চীনা ভদ্রলোকের

বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করছিলাম তখন সাথের চীনা যুবকগণ এসে জিজ্ঞাসা করল "কেমন লাগল ?" "তেমন নয় কিছু বন্ধু, আমার মন এসব থেকে যেন আপনা হতে সরে পড়ছে। দেখা যাক্ ভবিষ্যতে কি হয় ?"

এই কটি কথা বলেই যখন আমি চক্ষু মুদ্রিত করলাম তখন কয়েক জন আনামকে নিয়ে চীনা যুবকগণ নানা বিষয়ের সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সমালোচনার বিষয়বস্তু রাষ্ট্রনৈতিক এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে। যারা একদিন বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ-মন্দির তৈরীতেই ব্যস্ত থাকা একমাত্র জীবনের লক্ষ্যবস্তু করে নিয়েছিল তাদের মধ্যে দু'একজনকে নিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক কথা বলা কম কথা নয়। আজ যে সকল ভিয়েতনামীদের আমরা দিল্লী অথবা কলিকাতায় দেখে আনন্দিত হই তাদেরই দুঃখের সময়ের কথা আমি বলছি। একদিন যারা ঘৃণ্য কুকুর বিড়ালের মত পদাঘাত অথবা সামান্য মশা মাছির মত জীবন বলিদান করত তাদের দুর্দ্দিনের কথা বলা যেমন গরিমার বিষয় তেমনি তাদের সুসময়ের কথা বলাও আনন্দের বিষয়। সুসময়ের কথা ইংলিশ বই হতে অনুবাদ হবে, কিন্তু দুর্দ্দিনের কথা অনুবাদ হবে না। যারা দুর্দ্দিনে আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের চরিতামৃত অনেকে ভুলে গেছে। আমি কিন্তু ভুলিনি। আনাম এবং কোচিন চীনাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এখনও আমার প্রাণে ঝংকার দেয়, এখনও তাদের লাবণ্যপূর্ণ মুখের উপর অত্যাচারের কালিমা আমার মনে ভেসে উঠে। সেজন্যই সেই পুরণো কথা নূতন করে বলার প্রয়োজন।

একটু বিশ্রাম করেই গ্রাম ভ্রমণে বের হলাম। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা আমাকে দেখে হাটু গেড়ে অভিবাদন করল, বয়স্ক পুরুষগণ বসে নমস্কার জানালে। অবশেষে যখন স্ত্রীলোকগণও আমাকে পুরুষের মত হাটু গেড়ে অভিবাদন করছিল তখন আমি আর ঠিক থাকতে

পারলাম না। চিৎকার করে মালয় এবং শ্যাম ভাষায় বললাম, তোমাদের রীতিনীতি যাই থাক্ আমাকে সম্মান দেখিয়ে অবমাননা করো না। তোমাদের ধারণা ভুল। আমি তোমার দেশের পুলিশ নই। আমি বিদেশী। হঠাৎ কোথা হতে আমার চীনা সাথী এসে হাজির হল। সে আমার কথাগুলি সঠিক কম্বোজ ভাষায় অনুবাদ করে গ্রামবাসীকে শুনাল। অবস্য তাতে যোগ বিয়োগ নিশ্চয়ই হয়েছিল নতুবা কম্বোজ পুলিশ আমার পেছন নিত না। সেদিন বিকাল দুটার সময় শ্রীস্বপনের দিকে রওয়ানা হই এবং গভীর রাত্রে গ্রামে পৌঁছি।

আগামীকাল সকালবেলা আমাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিছানায় বসে সে কথাই ভাবছিলাম, সদর রাস্তায় তখনও জল জমে রয়েছিল তবুও যেতে হবে। সন্ধ্যার পর পোষ্টমাষ্টার আসলেন এবং আমাদের দেশে কি প্রকারে সিভিল ডিস্-অবিডিয়েন্স্ চলছে তারই কথা জানতে চাইলেন। আমি যা জানতাম অর্থাৎ সংবাদপত্রে যা পড়েছিলাম তাই সংক্ষেপে তার কাছে বল্লাম। আমার কথা শুনে তিনি থ মেরে গেলেন এবং বললেন তাঁদের দেশে ভারতের সত্যাগ্রহীদের বৃটিশরা যেমন ব্যবহার করে যদি ফরাসীরা সেইরূপ ব্যবহার করে তবে কোন কথাই ছিল না, তারাও সত্যাগ্রহ নিশ্চয়ই করতেন। কিন্তু ফরাসীরা অন্য ধরণে শাসন চালায়।

তর্ক-যুদ্ধে অগ্রসর হলাম। বল্লাম, একবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করুন, দেখবেন মহাবর্বরও হায়রাণ হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করবে। আমাদের দেশে অনেক পুলিশ সত্যাগ্রহীর প্রতি অত্যাচার করে হার মেনেছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী চিন্তিত হয়ে পরেছে। পোষ্টমাষ্টার আমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সত্যাগ্রহের কি যে প্রতিভা তা আমার পক্ষে বলাও সম্ভব ছিল না কারণ কোনদিন আমি

সত্যাগ্রহ করিনি এবং সত্যাগ্রহ কি রকমে করা হয় তা দেখিনি। তবে এটা বুঝেছিলাম, পাওনা আদায় করতে হলে যখন শরীরের শক্তি কম থাকে তখন যদি সত্যাগ্রহ করা হয় তবে শরীরের শক্তি বেশ বেড়ে যায় এবং মনেও বেশ উগ্রভাব আসে। সিংগাপুরের আমেরিকার কন্সালের দরজায় সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে সেরূপই কিছু আভাষ পেয়েছিলাম।

গভীর রাত্রে আমার সাহায্যকারী ছেলেটি এসে জানাল যে সে আগামী-কাল এখানে থাকবে না। পুলিশকে ফাঁকি দেওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাকে বললাম ধরে নেও যেন অর্থের লোভে তুমি আমাকে স্থান দিয়েছ এরূপ ভাণ করে যদি তোমার ঘরভাড়া নিয়ে আমার সংগে একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দেও তবে হয়ত পুলিশ তোমাকে কিছু নাও বলতে পারে। সে আমার কথা শুনে একটু হাসলে তারপর করমর্দ্দন করে বিদায় নিলে। অনেক রাত আমার ঘুম হয়নি। তারপর যখন ঘুম হল তখন এক ঘুমেই পরের দিনের বেলা এক প্রহর।

পথে একাকী বের হলাম। কেউ বিদায় দিতে এল না। এত বন্ধুবান্ধব কোথায় লুকিয়ে গেল? ঘণ্টা দুই চলার পর একখানা গ্রামে পৌঁছে একটু বিশ্রাম করলাম তারপর আবার পথে আসলাম। একটু গিয়েই পথের উপর জল চলতে দেখে একটুও না ঘাবরিয়ে আজই বাটাংবং (Batang Bong) পৌঁছতে হবে এই প্রতিজ্ঞা করে পুরাদমে সাইকেল চালাতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু পথ যেন একটুও কমছিল না। দুপুরবেলা একটি গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রাম কর্দ্দমাক্ত। এরূপ গ্রাম কম্বোজদেরই বাস করতে দেখা যায়। কোচিনচীন, আনাম অথবা তংকিনে এরূপ ধরণের কর্দ্দমাক্ত গ্রাম দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রামের পাশেই একটি মন্দির। মন্দির নানা জাতীয় বৃক্ষে এবং উই পোকার ঢিবিতে ভর্ত্তি তবুও মন্দির দেখা চাই। মন্দির ধ্বংস হয়ে হয়ে গিয়েছিল।

যে সকল মূর্তি সেখানে ছিল তার অনেকগুলি পথের উপর ভেংগে ব্যবহার করা হয়েছিল, বাকি যে কয়টি ছিল, তার মধ্যে মস্ত বড় একটি গণেশ আর কয়েকটি শিব লিংগ। তাও কোনদিন পথের মজুর ভেংগে ফেলে পথে ঢেলে দেবে বলেই মনে হল। অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, এরূপভাবে দেবদেবীর মূর্তি ভেংগে পথে ব্যবহার হচ্ছে দেখে কি আপনার একটুও কষ্ট হয়নি? উত্তরে বলব, না বন্ধুগণ তা দেখে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। এটা পাথর দিয়ে তৈরী তা আমার জানা ছিল এবং পাথর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা থাকায় পাথর ভেংগে দেখবার প্রবৃত্তিও ছিল। যেদিন কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখে ফিরছিলাম সেদিন পথে একটি পাদ্রীর সংগে দেখা হয় পাদরী বলছিলেন "ঐ যে মসজিদ দেখছ তাতে জল ব্যবহার হয়নি, রক্ত দিয়ে জলের কাজ শেষ করা হয় আর আমার ঐ যে গির্জা তাতে শুধু জল ব্যবহার করেছি সেজন্য অনেক বৎসর এই গীর্জা দাঁড়িয়ে থাকবে। পৃথিবী ভ্রমণের পূর্বে নিজের দেশের অনেক মন্দির এবং মস্‌জিদ দেখেছিলাম বলেই পাথর দিয়ে পাথর ভাংগা দেখতে আর কষ্ট হত না। কিন্তু কষ্ট হত যখন দেখতাম মায়ের ক্রোড়ে শিশু পথ্যের অভাবে মরছে, যখন শিশু খাদ্যাভাবে কাঁদছে, তোমরা বলবে এটা শিশুর কর্মফল; আমি বলব, তোমরাই যারা মন্দির এবং মস্‌জিদকে পবিত্র ভাব, শিশুকে কর্মফলের জন্য দায়ী কর সেই তোমরাই এই মহাপাপের জন্য দায়ী।

মন্দির দেখার পর গ্রামে যাই। গ্রামের লোক ভেবেছিল আমি এক জন পুলিশ অফিসার, সেজন্য যারা পারল তারা সরে পড়ল, যারা সরে পরতে পারল না তারা হাতজোড় করে আমার সামনে দাঁড়াল। তাদের হাতে পাস্‌পোর্ট্ খানা দিয়ে বল্‌লাম, গ্রামবাসী ভেবনা আমি তোমাদের দেশে পুলিশের কাজ করতে এসেছি। আমি ভারতের

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

"ফ্রেন্‌চ সাবজেক্ট" নই আমি "বৃটিশ সাবজেক্ট"। তোমাদের যে দুরাবস্থা আমাদের সেই একই দুরাবস্থা।

কম্বোজের সন্ন্যাসী কাউকে সম্মান করে না এমন কি ফ্রেন্‌চদের প্যাপেট রাজাও সন্ন্যাসীদের কাছে জানু নত করতে বাধ্য। গ্রামের একজন সন্ন্যাসী আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে "নমস্কার" করলাম তিনি কিন্তু "প্রতি নমস্কার" করলেন না। এতে আমার বেশ রাগ হয় কিন্তু রাগ প্রকাশ না করে সন্ন্যাসীকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। সন্ন্যাসী চিন্তিত মনে অনেকক্ষণ পরে বল্‌লেন "আমার পরণে এখনও গৈরিক বস্ত্র রয়েছে অতএব আমি মিথ্যা বলব না, কিন্তু আমি পর্যটকের প্রশ্নের জবাব দেব না।" বুঝলাম সন্ন্যাসী আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় করছেন, পাছে কম্বোজরাজ তাঁর ক্ষতি করেন। প্রশ্ন করছিলাম কম্বোজরাজের নিয়মতন্ত্র শাসন শ্যাম দেশের স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনের চেয়ে ভাল কি মন্দ? সন্ন্যাসী বেশীক্ষণ আমার কাছে বসে থাকা যুক্তি-যুক্ত হবেনা ভেবে, অন্যত্র কাজ আছে বলে চলে গেলেন।

লক্ষ্য করে দেখলাম, বিবাহিত স্ত্রীলোক এবং যাদের বিয়ে হয়নি—তারা সকলেই ভীত। পরে জেনেছিলাম, কম্বোজরাজ ফরাসী সেপাইদের সুখী রাখার জন্য রেশনের সংগে দলে দলে যুবতী পাঠাবারও বন্দোবস্ত করেন এবং এই যুবতীর দল যোগার করে দেয় ভারতীয় পেটী-এড্‌-মিনিসট্রেটিভ্‌ অফিসাররা।" পুনুমপেণে এই কথাটি শুনার পর থেকে ভারতীয় নিকৃষ্ট-শ্রেণীর শাসন সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেই চলতাম।

গ্রামের অবস্থা দেখে ইচ্ছা হচ্ছিল ছোট্ট গ্রামটিতে থেকে পলিটিকেল কাজ করি। এরূপ ইচ্ছা মনে জাগে যখন শরীরে বল থাকে এবং কাজের পদ্ধতি জানা থাকে। কাজের পদ্ধতি জানা ছিলনা বলেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

সন্ধ্যার পূর্বে বাটাং-বং পৌঁছি এবং একটি হোটেলে স্থান নেই। হোটেলের মালিক চীনা। উপযুক্ত ভাড়া নিয়ে সে আমাকে একটি রুম ভাড়া দেয় এবং চুপচাপ করে শুয়ে থাকতে বলে। তাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নিকটস্থ খাবারের দোকানে কিছু খাবার খেয়ে শুয়ে থাকি। চীনা হোষ্টেল-মালিক জানিয়েছিল সে আমার নাম হোটেলে রেজেষ্টারীতে লিখবে না, কারণ আমার আসার পূর্বেই পুলিশ সকল হোটেলের মালিককে জানিয়ে দিয়েছিল যদি কোন ভারতীয় পর্যটক হোটেলে স্থান নেয় তবে তৎক্ষণাৎ যেন পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয়। চীনা ভেবেছিল হয়ত আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরা হবে। সে তা পছন্দ করছিল না সেজন্যই হোটেলের পশ্চাৎভাগে একটা নিরিবিলি রুমে স্থান করে ছিল।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠবার পূর্বেই একটি চাকর এসে আমাকে জাগাল এবং বল্‌ল আমি যেন এখনই হোটেল ছেড়ে চলে যাই নতুবা পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করবে। বয়টিকে অভয় দিয়ে বল্‌লাম "আমি এখনই চলে যাচ্ছি।" তাড়াতাড়ি করে পোষাক পরে সাইকেল নিয়ে পথে না দাঁড়িয়ে মস্ত বড় একটা রেস্তোরাতে খেতে লাগলাম। ইত্যবসরে একটা কম্বোজ পুলিশ আমাকে ফ্রেন্‌চ ভাষায় কি বল্‌ল। আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লাম "তুমি এখন যাও, কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম করে "সুরাতী" অর্থাৎ পুলিশ স্টেশন যাব"। লোকটা বুঝল আমাকে ধমকিয়ে কিছুই করতে পারবে না, অগত্যা সে আমার পাশে বসে থাকল। তারপর একটু বিশ্রাম করলাম এবং সাইকেল নিয়ে বের হলাম।

দেখলাম ছোট্ট শহরটি ঝক্‌মক্ করছে। কোথাও আবর্জনা নাই। বাড়ি ঘর, রাস্তা সবই পরিস্কার। পথের দুপাশের বৃক্ষগুলিও পাতায় সুশোভিত। পথে পানের পিচ্‌কি ফেলার অধিকার নাই অবশ্য প্রায়

সকলেই পান খায়। বাড়িতে কেউ চীৎকার করে কথা বলে না কারণ ফ্রেন্চ সরকার তা পছন্দ করে না। সর্বোপরী একটি আরাম দায়ক বিষয় লক্ষ্য করলাম, কোথাও কাটা মাংসের দোকান নাই। মাংস বিক্রয় হচ্ছে, কিন্তু তা কাগজে এক এক কিলো করে বাঁধা। শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম।

মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যও দেখছিলাম, কিন্তু কম্বোজ পুলিশের দেরী সহ্য হচ্ছিল না। তার মুখের দিকে চেয়ে মনের অবস্থা কি চিন্তা করছিলাম তাতে বেশ রাগ হয়, কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। অবশেষে 'সুরাতী' অর্থাৎ পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে দেখি ফ্রেন্চম্যান অগ্নিশর্মা হয়ে আমার অপেক্ষা করছে।

যাবা মাত্রই জিজ্ঞাসা করল "এখানে কতদিন থাকবেন ?"

"মঁশিয়ে সেকথা ত আমি বলতে পারব না। মাত্র তিন মাসের থাকার অধিকার পেয়েছি, তা আমার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে কাটিয়ে দেব।"

"তাই যদি হয়, তবে পাসপোর্ট আমার কাছে রেখে যান এবং যেদিন এখান থেকে চলে যাবেন সেদিন যেন পাসপোর্ট নিয়ে যান।"

"তাই হউক মঁশিয়ে এখন আমি চল্‌লাম।" পাসপোর্ট পুলিশ স্টেশনে রেখে দিয়ে অন্য আর একটি চীনা হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত করলাম এবং স্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগে বিকালে দেখা করবার মনস্থ করে উপরে গিয়ে শুয়ে থাকলাম।

বাটাংবং শহরে কয়েকজন গুজরাতী ব্যবসায়ী ছিলেন তারা প্রায় সকলেই বোরা শ্রেণীর শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। বোরা শ্রেণীর শিয়ারা পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা তাদের আচার ব্যবহারে বেশ বুঝা যায়। বোরাদের মধ্যেও একজন পর্যটক ছিলেন তিনি কিন্তু ইন্দোচীনে যাননি বলে

বোরাগণ বড়ই দুঃখিত ছিলেন। আজকাল অনেক পৃথিবী পর্যটক দেখতে পাওয়া যায় যারা ইন্দোচীন বাদ দিয়েই চলেন। এটার একটি কারণও আছে। সাইগনে কোনও বড় জাহাজ কোম্পানীর জাহাজ যায় না। সেজন্যই সখের পর্যটকগণ সেই দেশটিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

একজন ভারতীয় পর্যটকের পেছনে স্থানীয় পুলিশ লেগেছে, সে কথাটা ভারতীয় মহলে পৌঁছামাত্র ব্যবসায়ীরা আমার খোঁজে বের হয়ে এবং আমি যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলে এসে উপস্থিত হন। আমি প্রত্যেকটি ভদ্রলোককে যথাসম্ভব সম্মান দিয়ে বসিয়ে পথে যে সকল ঘটনা ঘটেছে বলার পর একজন ভদ্রলোক বল্‌লেন—"বন্ধু হুসিয়ার, এখানে কোনরূপ গণ্ডগোল করলেই ফরাসীরা এদেশ থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দেবে। ভারতের পারসী পর্যটক বাবাসোলা এবং বমগড়া নামক দুজন পর্যটককে এদেশের সরকার তাড়িয়েছে, এবার আপনার পালা।" ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংবাদটি পেয়ে একটু চিন্তিত হলাম। তারপরই ভয়টাকে এক ধাক্কায় দূর করে দিয়ে ব্যবসায়ীদের সংগে তাদের বাড়িতে গিয়ে দ্বিপ্রহরে খাবার খেয়ে স্থানীয় লোকের সংগে মিশে গিয়েছিলাম।

ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ আমার অর্থের অভাব হতে দেবেন না এই ইংগিত দিয়েছিলেন। একজন বৃদ্ধ বোরা আমাকে বলছিলেন "বাবু অনেক টাকা জমা করেছি, কিন্তু টাকা পয়সায় শান্তি আনতে পারে না। আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ব্রাহ্মণ, গ্রহণ করেছিলেন ইস্‌লাম ধর্ম, যদি ইচ্ছা হয় তবে আগামী কল্য আমরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। অতএব ধর্ম এবং অর্থ যে কোন মানুষ যে কোন সময়ে ওদল এবং বদল করতে পারে, কিন্তু দেশের

স্বাধীনতা যে কোন সময় যে কোন লোক আনতেও পারে না পরিত্যাগও করতে পারে না। তোমরা হলে বাংগালী, তোমরাই আমাদের দেশের স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হবে, এটা আমার অন্তরের কথা। তোমার পৃথিবী ভ্রমণও আমাদের স্বাধীনতা আনয়নে সাহায্য করবে এই ভরসা নিয়েই আমি তোমার অর্থাভাব হতে দেব না। এখন তুমি স্থানীয় লোকের সংগে গিয়ে মেলামিশা কর, কিন্তু মনে রেখো এখানকার পুলিশ বড়ই দুষ্ট এবং ধূর্ত্ত।

বৃদ্ধের কথা শুনে মনে বেশ উদ্দীপনা এসেছিল কিন্তু বাইরে গিয়ে একটি কম্বোজ যুবকের সংগে কথা বলতে সক্ষম হলাম না। তারা সবাই ব্যস্ত, তারা সবাই স্বাধীন কারণ তাদের রাজা আছে। একজন আনাম যুবক বললে—"মশিয়ে একজন কম্বোজ যুবকও কথা বলবার জন্য পাবেন না, তারা হয় শ্যামদেশের অধিবাসীদের গাল দিয়ে জাহান্নামে পৌছাবে, নয়ত আনাম সম্রাটের অশুভ কামনা করবে। তারা চায় যেভাবে আছে তেমনি থাকতে এর বেশি নয়।" বাস্তবিক পক্ষে নিজে যেচে গিয়ে অনেক কম্বোজ যুবকের সংগে কথা বলেছি কিন্তু কোথাও প্রগতিশীল ভাবধারার সন্ধান পাইনি। সর্বত্র অসাড়তা বর্ত্তমান। সকলেই আমোদে ব্যস্ত। আমোদ আবার কিসের? সিনেমাতে যেতে পয়সা লাগে অতএব কম্বোজ যুবক সেদিকে যায় না, তারা যায় পুতুল নাচ দেখতে। পান খেয়ে এবং দেশী মদ খেয়েই তারা সুখী থাকে আর মাঝে মাঝে যখন ফরাসী পুলিশ এসে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যায় তখন ফরাসী পুলিশকে "ফ্রা" মানে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করে।

বাটাংবং-এ এসে সাথী পেলাম আনাম এবং চীনা যুবকবৃন্দ। আনামীরা সরল, চীনারা গম্ভীর। কিন্তু একবার চীনাদের গাম্ভীর্যের

দেওয়াল ভাংগতে পারলে বাজি মাৎ! গাম্ভীর্য তখন আর থাকে না। মহা বিপদেও হাসিমুখেই বিদেশীকে গ্রহণ করে। চীনাদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে যে গাম্ভীর্যের দেওয়াল ছিল তা অনেক দিন পূর্বেই ভেংগে পড়েছিল। আমি চীনাদের সংগে আমার অজানিতে মিশে গিয়েছিলাম। আমি যে সকল চীনার সহানুভূতি পেয়েছিলাম তারা আজ উত্তর চীনে চিয়াংকাইসেকের সংগে লড়ছে।

প্রথম প্রথম বুঝতেই পারতাম না, স্বাধীন দেশের লোক কি করে নিজের সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। শ্যামদেশে পা দেওয়া মাত্রই টের পেলাম এখানেও রাজার বিরুদ্ধে এক গোপনীয় ষড়যন্ত্র চলছে, তারপর বেংককে এসে বুঝলাম চীনাদেরও ঘর ঠিক নেই, তারাও চিয়াংকাইসেকের বিরুদ্ধাচরণ করছে। আর এখানে এসে বুঝতে পারলাম, কম্বোজের লোক ঠিক ঠিক ভাবে Dog in the manger বলতে যা বুঝায় তাই করছে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে! পৃথিবীর সর্বত্র নবজাগরণের সাড়া পড়েছে কিন্তু কম্বোজের লোক যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ভিয়েতনামীরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে নানারূপ বিদ্রোহ করেছে, তাতে অনেক লোকক্ষয় হয়েছে কিন্তু কম্বোজীরা ধর্ম এবং রাজতন্ত্রের মোহ একটুও কাটাতে পারছিল না। ধর্ম এবং রাজতন্ত্রের মোহ যে কত সর্বনাশক তা কম্বোজদের দেখেই বুঝতে পারা যায়।

সন্ধ্যার পর বোরা ধনীর বাড়িতে এক সভা হয়। সভায় অনেক লোক আসছিল। সকলেই ভিয়েতনামী। সভার শুরুতে আমার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে সভার কার্য শেষ করেন। তারপর আরম্ভ হয় অন্য বিষয়বস্তু নিয়ে সমালোচনা। এতে অনেক রাত হয়। বৃদ্ধ বোরা সভার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ধৈর্য

দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলাম। সভার শেষে যখন হোটেলে রওয়ানা হলাম তখন মনে হল কে যেন আমার পেছন নিয়েছে। লোকটা আমার সংগে হোটেল পর্যন্ত এসেই চলে যায়। এতে একটু চিন্তিত হই নাই।

পরের দিন সকাল বেলা বৃদ্ধ বোরার সংগে পুনরায় দেখা করে পুনুমপেনের দিকে রওয়ানা হই। আমার ইচ্ছা ছিল সেদিনই পুনুম্পেন্ পৌছি কিন্তু প্রবল বৃষ্টির জন্য এবং ফরাসী ল্যাণ্ড ইনিস্পেক্টরদের দরিদ্র চাষীদের প্রতি অত্যাচার দেখার জন্য সেদিন আর পুনুমপেন পৌছা সম্ভব হয় নাই।

বৃষ্টি বন্ধ হবার পরই ফরাসী ইনিস্পেক্টরগণ গ্রামে প্রবেশ করে দরিদ্র এবং আধমরা কৃষকদের ধরে জমিতে এনে নামাতে লাগল। জমিতে তখনও প্রচুর জল ছিল। অনেক কৃষক জমিতে নামতে চাইছিল না কারণ জমিতে এত জল ছিল যে ডুবে যাবারও ভয় ছিল। কিন্তু উপায় তাদের ছিল না। পেছন দিক থেকে ফরাসী অফিসাররা পিস্তলের বাঁট দিয়ে তাদের কোমরে ঠেলা দিয়ে জলে নামিয়ে দিচ্ছিল। ফরাসী অফিসারদের এত মাথাব্যথা হবার কারণ কি তা জানবার আগ্রহ সকলেরই হয়। আমারও হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম জমিতে ধান হলে সেই ধান চাষাদের কাছ থেকে অল্প মুল্যে কিনে বেশি দামে বিদেশে চালান দেওয়া হবে। ধান উৎপাদনের উপরই ইনিস্পেক্টারদের চাকুরি নির্ভর করে, সেজন্যই এদের এই আগ্রহ এবং অত্যাচার।

অনেকগুলি গ্রাম পেরিয়ে যখন পুসাত (PUSSAT) নামক শহরে পৌছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমার ইচ্ছা ছিল তাড়াতাড়ি করে শহরে পৌছি কিন্তু একটা পুলিশ আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। দেখামাত্র সে আমাকে ডাকলে। আমি তার ডাক অবহেলা করেই শহরের ভেতর পৌছলাম। সেও আমার পেছন পেছন ছুটল।

অবশেষে পুলিশটা ধৈর্য হারিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করল। আমিও চেঁচিয়ে বললাম, পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে পাশপোর্ট জমা দেব। হোটেলে পৌঁছবার পর কম্বোজ পুলিশ চলে গেল এবং তাড়াতাড়ি করে একজন সারজেন্টকে সংগে নিয়ে ফিরে এল। সারজেন্ট ভদ্রভাবেই আমার পাশপোর্ট চাইল। আমি তাকে পাশপোর্ট দিয়ে বেশ আরাম বোধ করলাম নতুবা কম্বোজ পুলিশটা হট্টগোল বাধিয়ে দিত।

একটি মজার বিষয় লক্ষ্য করছিলাম। ইন্দোচীনের সর্বত্র যে সকল ফরাসীরা বাস করে তাদের প্রত্যেকেরই যেন পুলিশের ক্ষমতা ছিল। রাজার জাতের বাহাদুরী আছে বই কি?

পুসাতে পৌঁছে কতকগুলি চীনা যুবকের সংগে বেশ খাতির হয়। তারা ছিল প্রগতিশীল। পরের দিন সকাল-বেলা এখান থেকে রওয়ানা হবার কথা ছিল কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। চীনাদের মধ্যে যারা একটু ধনী তারা হাংকো ফ্লাডের জন্য চাঁদা উঠাচ্ছিল। চীনা ধনীরা নানারূপ সুন্দর সিল্কের পোষাক পরে শহরের সর্বত্র অন্য চীনাদের বাড়িতে যাচ্ছিল এবং সবিনয়ে চাঁদা চাইছিল। চীনা যুবকগণ চাঁদা উঠাতে সাহায্য করছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম চীনা যুবকেরা গোপনে অনেক চাঁদা উঠিয়েছে। গোপনে কাজ করাটা চীনা যুবকগণ বড়ই ভালবাসে। তারা দল পাকিয়ে কারো বাড়িতে চাঁদা উঠাতে যেত না। একজন কি দুজনে কারো বাড়িতে গিয়ে চাঁদা চাইত এবং রসিদ দিয়ে চলে আসত। তাদের কার্য-তৎপরতা দেখে সুখী হতে হয়েছিল। সেরূপ কর্মশক্তি আমাদের মাঝে নাই বললেও চলে। আমরা হাউমাউ করি এবং তর্ক করতে ভালবাসি। এমনও দৃষ্টান্ত দেখেছি যাদের চাঁদা দেবার ক্ষমতা নাই তারা প্রকাশ্যেই বলত তাদের কাছে টাকা নাই, এমন কি অনেকে ম্যানিবেগ পর্যন্ত এনে হাজির করত।

আমাদের কিন্তু সে অভ্যাস নাই, আমাদের কাছে টাকা নাই সে কথা স্বীকার করি না, বাজে কথা বলে চাঁদা আদায় কারীদের বিদায় করার চেষ্টা করি, এতে সময়ের অপব্যবহার হয় সেকথাও আমরা বুঝি না।

শহরের কাছেই একটি বাজার। বাজারটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কথা রক্ষা করার জন্য বাজার দেখতে যাই। বাজার দেখে মনে হল যেন সাওতাল-পরগণার কোনও বাজারে এসেছি। সাওতল পরগণার বাজারের তুলনা করার একটি কারণ আছে। সেই কারণটি হল বাংলা অথবা আসামে যে সকল বাজার বসে তাতে তেলে ভাজা মালপোয়া, পায়স, চালের পিঠা বিক্রি হয় না। সাওতাল পরগণার বাজারে এসব বিক্রি হয়। তা দেখে শুধু আনন্দ পাই নাই, রসনাকেও তৃপ্ত করেছিলাম। গুলি-পিঠাগুলিতে গুড়ের সংযোগ থাকায় রসগোল্লার মত একটার পর একটা খেয়ে যখন পেট বোঝাই হয়েছিল তখন দোকানীকে অর্দ্ধ পেস দিয়ে বিদায় নিয়েছিলাম। দামটা আমেরিকান ধরণেই দিয়েছিলাম। একজন পান্জাবী মুসলমানের কাছ থেকে জেনেছিলাম মাত্র দু সেন্টের পিঠা খেয়েছি, আটচল্লিশ সেণ্ট বেশি দিয়েছি।

বাজার দেখে নিকটস্থ মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। বুদ্ধদেবকে ধ্যানমগ্ন দেখে পিঠার স্বাদ ভুলে গিয়ে তাঁকে বলেছিলাম, হে মহামুনি আমার পর্যটন যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। পাশে দাঁড়ানো ইংলিশ ভাষায় অভিজ্ঞ লোকটি জিজ্ঞাসা করল চোখ বুঝে কি বল্লেন্। তার কাছে কিছুই গোপন করি নাই সত্য কথা বললাম। সে আমাকে ধমক দিয়ে বল্ছিল "এটা একটা পাথরের মুর্তি, এটার কাছে প্রার্থনা করা আর পায়ের নীচের পাথরের কাছে বক্তব্য বলা একই কথা। মনকে শক্তিশালী করুন আপনি কার্যে সফল হবেন।" অপাত্রে কখনও উপদেশ

দিতে নাই। আমি ছিলাম তখন অপাত্র। চীনা যুবকের উপদেশে আমার মনের পরিবর্তন আনতে পারে নাই।

মন্দির হতে আমরা একটি মৃতদেহ সৎকার দেখতে যাই। মৃত লোকটি সংগতিপন্ন ছিল সে জন্যই তার শবদাহে দশকর্ম নিয়মিত-ভাবে হয়। কল্‌কাতার নীমতলাতে যারা মৃতদেহ সৎকার করতে দেখেছেন এখানের সৎকার সেরূপ নয়, একদম বাংগালী আসামী, উড়িয়া পাহাড়ীদের গ্রাম্য প্রথায় সৎকার হচ্ছিল। সৎকার স্থানে প্রথমত মৃতের শরীরের অনুপাতে লম্বা একটি নালা কাটা হয়। সেই নালাটার ঠিক মধ্যস্থলে আর একটা নালা কাটা হয় তা একটু ছোট। লম্বা নালাটার দুদিকে দুটা মোটা গাছের টুকরা রাখা হয়। গাছের টুকরাগুলি যাতে স্থানচ্যুত না হয় সেজন্য খুটির ব্যবহার হয়। খুটিগুলি মাটিতে পুতে দেওয়া হয়। খুটি এবং দুটা মোটা গাছের কাঁচা টুকরা ব্যবহার হয়। তারপর দুটা মোটা গাছের টুকরার ভেতর দিয়ে দুআড়া করে বাঁশ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাঁশগুলি চার পাঁচ হাত লম্বা তারই উপর সবটাকে রেখে দেওয়া হয়। শব রাখারও নিয়ম আছে। পুরুষকে উপুত করে আর স্ত্রীলোককে চিৎ করে শুয়ানো হয়। শব রাখা হয়ে গেলে শবের উপর নানারূপ সুগন্ধি কাঠ; মৃতব্যক্তির ভাল পোষাক সবই সুন্দর করে গুছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কতকগুলি লোক শবের চারিদিক ঘেরে কতকক্ষণ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করার পর একই সংগে চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দেয়। যারা শব দাহ করে তারা সকল সময়ই শবের কাছে থাকে কারণ কি জানি যদি বাঁশগুলি পুড়ে যাবার পর শব মাটিতে পড়ে যায়। যখনই বাঁশ জ্বলে যায় তখনই আবার নূতন বাঁশ শবের গা-ঘেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। শবদাহ কতক্ষণ দেখে আমরা অদূরে পাকের ব্যবস্থা দেখতে গেলাম।

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

এদিকে যেমন শবদাহ হচ্ছিল তেমনি একটু দূরে নানারূপ অন্ন ব্যন্জনও তৈরী হচ্ছিল। তরকারীতে তৈলের ব্যবহার হয় নাই। তৈলের সাহায্য না নিয়ে কি করে পাক হয় তাই দেখছিলাম। ভাতের সংগে নানারূপ শাক দেওয়া হয়েছিল। অন্য আর একটা পিতলের বড় হাঁড়িতে নানারূপ সব্জি কেটে ছেড়ে দিয়ে সামান্য হলদী এবং কাঁচা-লংকা তাতে দেওয়া হয়েছিল। পাক হবার পর ভাতের এবং সবজির তরকারী বেশ সুগন্ধ-যুক্তই মনে হচ্ছিল। পাক হবার পরই কতকগুলি লোক খেতে বসে। এরা কে তা জানবার সময় ছিল না, কারণ চীনা যুবকগণ আমাকে এসব খুটিনাটি বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে নিষেধ করছিল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা সমিচীন হবে না বলে তাদের নিয়ে শহরে এসেই স্নান করতে যাই কারণ তখনও যেন আমার নাকে শবদেহের দুর্গন্ধ লেগে রয়েছিল।

স্নান করে বাইরে এসেই দেখতে পেলাম একদল অশ্বারোহী পুনুম-পেনের দিকে চলে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই অশ্বারোহী দল সাইগনের দিকে রওয়ানা হয়েছে। সাইগনের কাছে কোলন বলে একটি শহর আছে সেখানে নাকি বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। কি প্রকারে বিদ্রোহ দমন হয় তাই দেখার বড়ই ইচ্ছা হয় কিন্তু সাইকেলে কোলন পৌছতে কয়েক দিনেরই দরকার ছিল। মজার বিষয় এদিকে রেল-লাইন বসানো হয়নি। রেল-লাইন বসাতে বিশেষ কোনও অসুবিধা আছে তাও মনে হল নাই। এদিকে রেল-লাইন না বসাবার একটা উদ্দেশ্য ছিল। শ্যাম দেশে যাতে এদিকের যুবকবৃন্দ সহজে আসা যাওয়া না করতে পারে সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখার জন্যই রেল-লাইন বসানো হয় নাই। তবুও ইন্দোচীনের লোক শ্যামদেশে যেতে ভালবাসত। অবস্য ভিয়েতনামীরাও সে বিষয়ে অগ্রগামী ছিল। কম্বোজ ও শ্যামদেশের

পাশে থেকেও সেখানে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না, কারণ তারা হল রাজভক্ত প্রজা। নেটিভ রাজারা প্রজার মনে পরিবর্তন আসতে চায় না, সেজন্য ইউরোপীয়ানরা "নেটিভ" শব্দটি ব্যবহার করে। আরও দুঃখের বিষয় হল, কম্বোজরা ইনফরমারের কাজ করতে বড়ই ভালবাসে। তারা যদি কোনও ভিয়েতনামীদের শ্যাম দেশে পালিয়ে যেতে দেখে তবে তাকে পাকরাও করে তাদের রাজ-দরবারে হাজির করতে পারলেই বেশ আনন্দ পায়। এরূপ অসৎ মনোবৃত্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের সংগে কথা বলতেও আমার ঘৃণা করত, যদিও তাদের আচার ব্যবহারের সংগে আমাদের নিকটস্থ সম্বন্ধ ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

দ্বিপ্রহরে সামান্য একটু বিশ্রাম করে নিকটস্থ একটি বিদ্যালয়ে যাই। বিদ্যালয়টি আমাদের দেশের পাঠশালার মত। আমাকে দেখামাত্র শিক্ষক মহাশয় হাত জোর করে "নমস্কার" বল্‌লেন। আমার সাথীরা ছাত্রদের বুঝিয়ে দিল আগন্তুক ইন্‌স্পেক্টর নন্‌ অথবা রাজকর্ম্মচারীও নন্‌, একজন পর্যটক মাত্র। ছাত্রেরা হাটুগেড়ে বসেছিল। আমার সংগীদের কথা শুনে তাদের ভয় কমে গেল এবং সকলেই উঠে বসল। শিক্ষক মহাশয়ের ভয় তখনও যেন যাচ্ছিল না। অবশেষে একজন লোক শিক্ষক মহাশয়কে বল্‌ল "আপনি বোধ হয় মহাত্মা গান্ধির নাম শুনেছেন, যিনি এখন লণ্ডনে রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে গেছেন, ইনি সে দেশেরই লোক।" এতে লোকটার মুখ আরো কালো হয়ে গেল। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো ভাল হবেনা জেনে স্কুলটা একটু দেখে বেরিয়ে পড়লাম। আমার বেড়িয়ে আসার সংগে সংগেই দেখতে পেলাম একজন ফ্রেন্‌চম্যান বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে। তাকে কি করে সম্বর্দ্ধনা করা হয় তা দেখার জন্য ফিরে গেলাম। আমার সংগিরা পথে দাঁড়িয়ে থাকল। যা ভেবেছিলাম তাই দেখতে পেলাম। ছাত্র এবং

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

শিক্ষক ফ্রেন্‌চ্‌ম্যানের চরণে সকলে মিলে মাথা নত করছিল। আমাকে ফিরে আসতে দেখে শিক্ষক ফ্রেন্‌চ্‌ম্যানটাকে কি বলছিল।

আমি ঘরে গিয়েই ইংলিশ কায়দায় ফ্রেন্‌চ্‌ম্যানকে "সু-বিকালবেলা" বলেই জিজ্ঞাসা করলাম্‌, এখানে কি শুধু শ্যাম্‌ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় ?

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—এখানে শ্যাম ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না,—কম্বোজ ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনার কি চাই ?

কিছু চাই না মশাই আমি একজন পর্যটক্‌, দেখতে আসছি—এখানে কি রকমের শিক্ষা দেওয়া হয়।

এখন এসব কিছু হবে না মঁশিয়ে, এখান থেকে চলে যান।

একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে হট্টগোল বাঁধানো ভাল হবে না ভেবে, চলে আসতে বাধ্য হলাম। ধূর্ত্ত ফ্রেন্‌চ্‌ম্যানটার কথা অনেকক্ষণ মনে ছিল।

বিদ্যালয় হতে ফেরার পথে আমরা একটি মোটর মেরামতের কারখানায় যাই। কারখানায় যাবার পূর্ব্বে আমার সাথীরা আমাকে বলছিল আমি যেন শুধু ভিক্ষাই চাই। কারখানার ম্যানেজার কিরূপ লোক এবং সে কিরূপ মজুরদের শাসন করে তা আমি সেখানে গেলেই বুঝতে পারব। আমি যেন ম্যানেজারকে অত্যধিক সম্মান দেখাই সেকথারও ইংগিত দিয়েছিল।

কারখানার সামনে যাবামাত্র একজন কম্বোজ জিজ্ঞাসা করলে আমি কি চাই। তাকে বললাম, কারখানার ম্যানেজারকে সম্মান জানাবার জন্য এসেছি। ("মাও কাছি তাও ছায়া পুঁইয়া তাবের সাজা) তৎক্ষণাৎ লোকটা ম্যানেজারের কাছে গেল। ম্যানেজার আমার আগমন বার্ত্তা পেয়ে নিজেই চলে আসল। আমি তাঁকে অর্দ্ধ

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

কম্বোজ প্রথায় "নমস্কার" জানালাম। সে আমার করমর্দ্দন করে জিজ্ঞাসা করল আমি কি চাই? তার হাতে একখানা ভিক্ষাপত্র গুঁজে দিয়ে বললাম, তার কারখানার মজুরদের মধ্যেও ভিক্ষাপত্র বিলি করতে চাই। সে তৎক্ষণাৎ আমার হাতে দশ পেছ (পনর টাকা) দিয়ে বল্‌ল "মঁশিয়ে চলুন আমার সাথে।" আমি তার পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম। সে প্রত্যেক মজুরের হাতে এক একখানা করে কার্ড গুঁজে দিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে দু সেন্ট করে আদায় করতে লাগল। যারা দিতে পারল না তাদের নাম লিখে নিল এবং মাইনে হ'তে কাটবে তা জানিয়ে দিল।

কারখানার কম্বোজ ফোর্‌ম্যান্ দৈনিক মাত্র ষাট সেণ্ট পেত। সেই অনুপাতে অন্যান্যেরা ত্রিশ সেন্টের বেশী পেত না। ওদের মাইনে হ'ত তামার ফুটো পয়সায়। আজ আমাদের দেশে ফুটো পয়সা দেখে যারা উষ্মা প্রকাশ করেন তাদের জানা উচিত চোরা কারবারী তামা ব্যবসায়ীরা পয়সা গলিয়ে যে তামা পায় তার দাম দেড়া লাভে বিক্রি করে—এই চোরা কারবারীদের ব্যবসা বন্ধ করার জন্যেই আমাদের দেশে ফুটো পয়সার প্রচলন হয়েছে'

শ্যাম এবং ইন্দোচীনে কিন্তু এরূপ চোরা কারবারী বহু পূর্বেই ছিল। এদের অন্যায় কারবার বন্ধ করবার জন্যে ফুটো পয়সার প্রচলন ছিল। ঘন্টাখানেক পর ফেক্টরী ম্যানেজার আমার হাতে এক তোড়া ফুঁটো পয়সা দিয়ে বিদায় দিল।

বাইরে এসে ফুটো পয়সাগুলি আমার সাথীদের দিয়ে বল্‌লাম, এই পয়সা দিয়ে যাতে মজুরদের মধ্যে জাগরণ আসে তার চেষ্টা করবেন। তারপর মাথা নত করে পায়ে হেঁটে চিন্তিত মনে হোটেলে ফিরে আসলাম। হোটেলে এসে অনেকক্ষণ মজুরদের কথা ভাবলাম। সেই

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

শুক্না মুখ, মুখে গালের হাড় বেরিয়ে মুখের আকৃতি আরও বিকট করে তুলে। তবুও তাদের রাজভক্তি, তবুও তাদের ধর্মে শ্রদ্ধা দেখে মনে আগুন লেগেছিল। আমি আর কোথাও না গিয়ে শুধু মজুরদের কথাই ভাবতেছিলাম। ঠিক করে নিলাম আগামী কল্য যখন পথে বের হব তখন স্থানীয় শিশু এবং শিশুর মাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করব। আমার একটা দোষ পূর্বেও ছিল এখনও আছে, সেই দোষটি হল অপরের কথা সহজে বিশ্বাস করতে রাজি নই। চীনাদের কাছ থেকে শুন্‌ছিলাম কম্বোজে শিশু মড়ক অত্যধিক।

পরের দিন সকাল বেলা পুনুমপেনের (PNOMPENH) দিকে রওয়ানা হলাম। পথে গ্রাম পেলেই জল খাবার বাহানা করে গৃহস্থদের ছেলেমেয়েকে দেখে আসতাম। দেখতে পেতাম প্রায় ঘরেই শিশু নেই। যে সকল ঘরে সামান্য এক দুটি শিশু আছে তাদেরও পেট মোটা এবং সর্বাংগে চর্মরোগ। শিশুরা তাদের ক্ষতস্থানে শুধু চুলকায় আর কাঁদে। এরূপ ক্রন্দন দেখে আমি ঠিক থাকতে পারতাম না। আমার সংগে জাম্‌বাক্‌ থাকত। জাম্‌বাকের কৌটা হতে নিজের হাতেই শিশুদের ক্ষতস্থানে জামবাক্‌ লাগিয়ে দিতাম। জামবাক্‌ না থাকলে নানারূপ পাতা এনে তার রস দাদের স্থানে ঘসে দিতাম। এতে শিশুরা ক্ষণিকের তরে উপশম পেত।

আমরা নিজেদেরে সভ্য বলে চীৎকার করি। বিদেশের গল্প করে আনন্দ পাই। ইউরোপীয়ান্‌দের শ্রদ্ধা করি। জাপানীদের এশিয়াটিক বলে গর্ব অনুভব করি কিন্তু বিদেশের লোকের সংগুণ কখনও গ্রহণ করি না। জাপানীরা সকলেই গরম জলে স্নান করে। গরম জলে স্নান করলে চর্মরোগ হয় না, সে সংবাদ রাখতে আমরা রাজি নই। আমরা জানতে চাই জাপানীরা বুদ্ধদেবকে কতটুকু শ্রদ্ধা করে।

কম্বোজদেরও সেই অবস্থা। তারা মুখে মুখে বলে দিতে পারে পৃথিবীর কোন্ দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে কিন্তু যে সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে সেই দেশগুলির সৎগুণ গ্রহণ করতে মোটেই রাজি নয়। আমাদের দেশের মুসলমানরা যেমন আরবের সংগে তাদের কতটুকু রক্তের সম্বন্ধ আছে তাই নিয়ে গর্ব অনুভব করে, এখানেও কম্বোজরা অনুপাতে ভারতের বেহারীদের সংগে তাদের কতটুকু রক্তের সম্বন্ধ আছে তাই বিচার করতে ভালবাসে এবং তারই মিথ্যা স্বপ্ন রচনা করে গর্ব অনুভব করে। ধর্ম এমনই বালাই

পুনুমপেন

চলেছি পুনুমপেনের দিকে। পুনুমপেন হল কম্বোজরাজের পায়তখ্ত বা রাজধানী। পায়তখ্ত এবং রাজধানী এই উভয় কথা নিয়েই আমি চিন্তা করতাম। অন্তর থেকে ধ্বনি হত উভয় শব্দই খারাপ এবং বর্ত্তমান সমাজের ক্ষতিকর। পথ চলার সময় পথের দুদিকের দৃশ্যাবলী যখন মনকে আকর্ষণ করতে পারে না তখন মন অন্তর্মুখী হয় এবং নানা বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকে। পুনুমপেনের পথে আমার মনও নানা বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকত এবং চিন্তা এত গভীর হত যে সাইকেলের সামনে যে পর্যন্ত কোনও বিঘ্ন না আসত সে পর্যন্ত শুধু চিন্তা করেই সময় কাটাতাম।

তখনও পুনুমপেন অনেক দূরে। হঠাৎ পেছন থেকে একখানা মোটরকার আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মোটরের আরোহী গুজরাতী হিন্দু এবং মুসলমান। তারা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু তাদের ড্রাইভার ভিয়েতনামী লোকটি আমার পরিচিত ছিল। সে আমাকে

দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলে, যেন তার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই। আমিও তাকে কোন বিরক্ত না করে গুজরাতীদের সঙ্গে কথা বললাম। গুজরাতীরা তাদের বাড়িতে গিয়ে যেন থাকি সেকথা বার বার বলে মোটরকার হাঁকিয়ে বিদায় নিলেন।

ইতিমধ্যে আকাশ মেঘে ঢেকে ফেলল। বংকিমী ভাষা "বক উড়িল" তারপর কি হল সেকথা সবাই জানেন। আমি তখন কি "করিলাম" সকলেই জিজ্ঞাসা করবেন? গায়ের সার্ট টা খুলে কেন-বাসের পুটলীর ভেতর রেখে দিলাম। তারপর আমাকে পায় কে? বৃষ্টির মধ্যে গরম দেশে সাইকেল চালানো বড়ই আরামের। আমার সাইকেলও পবন বেগে ছুটল। পেছন দিক থেকে বাতাস এসে সামনার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তখন ধর্মে আস্থা ছিল সেজন্য গান ধরলাম "আমি উচ্চ আশায় পাল তুলে দিয়েছি হরি কৃপা পবনে ভেসে যায়"। আমার সাইকেল বাস্তবিকই ভেসে চলছিল। এতে আমার বেশ আনন্দ হচ্ছিল।

ঘন্টা—খানেক চলার পরই হাই-ওয়ের উপর জল জমতে আরম্ভ করল। মাছ জলে চলতে লাগল। মাছের খেলা দেখে অগ্রসর হতে ছিলাম। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে আসল। গভীর অন্ধকারের রাত্রে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে আর থেকে থেকে বজ্রপাত হয় তবে কেমন লাগে? আমার কিন্তু লাগছিল বেশ। অন্ধকারে মহাত্মা-গান্ধীর নিষ্ঠা-পুর্ণ-মুখখানা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম আর যত আপদ-বিপদ সবকে এড়িয়ে চলছিলাম। নিউ ইণ্ডিয়ার প্রবন্ধগুলি আমার চোখে যেন ভেসে উঠছিল। বড়দলীর সত্যাগ্রহের চিত্রগুলি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম আর তারই মাঝে সেই নিষ্ঠাপূর্ণ মুখখানি যেন আমাকে সাহস দিচ্ছিল। বাস্তবিক সাহস পাচ্ছিলাম নতুবা চলতে পারতাম না।

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

কিন্তু শরীর যখন দুর্বল হয়, মন তখন কিছুই চিন্তা করতে পারে না। তখন সকল কথা ভুলে যেতে হয়। ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজে শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। দাঁড়াবার ক্ষমতা লোপ পেতেছিল। শহর যে কাছে বুঝতে পারছিলাম না বলে পথের মাঝেই সাইকেল হতে নেমে মাটিতে বসে পড়েছিলাম। কতক্ষণ বিশ্রাম করে সাইকেলের বাক্স হতে রুটি মাখন বের করে খেয়ে ক্লান্তি দূর করে আবার যখন সাইকেলে বসতে যাচ্ছি তখন দেখতে পেলাম হঠাৎ বিজলী বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। মিনিট পাঁচেক চলার পরই একটি চীনা হোটেলের দরজা খুলা দেখে তাতেই ঢুকে পরলাম। চীনা আমার কাছ থেকে নগদ এক পেসো আদায় করে রুম্ দেখিয়ে দিল। রুমে গিয়ে পুটলীটা রেখে নীচে এসে সাইকেলটি ভাল করে মুছে পুনরায় কলের জলে স্নান করলাম এবং বয়ের সাহায্যে একটি তাজা "পাও" মানে রুটি আনিয়ে কাফির সংগে খেয়ে যখন বিছানায় শুলেম তখন মনে হল ছোটবেলার একটা গল্প। এখানে গল্পটা বল্‌লে দোষ হবে না।

গল্প লেখার টেকনিক্ এখনও শিক্ষা করি নাই অতএব সংক্ষেপে গল্পটি বলছি। কোনও মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ তার আত্মীয়ের বাড়ীতে রওয়ানা হয়েছিল। পথে অনেক রাত হয়ে যায়। হঠাৎ পথের পাশে একটি সজ্জিত বাড়ী দেখতে পেয়ে সেখানে সে অতিথি হয়। অতিথিকে নানারূপ সুখাদ্য এবং শুবার জন্য ভাল বিছানা দেওয়া হয়। রাত্রে লোকটার বেশ সুনিদ্রা হয়। পরের দিন সকালবেলা যখন তার ঘুম ভাংল তখন অনেক বেলা হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পেল মাটিতে শুয়ে আছে। আমিও শুয়ে ভাবছিলাম হয়ত কাল সকালে পথের পাশে কোথাও শুয়ে আছি দেখতে পাব। এর বেশি আর চিন্তা করতে সময় পাইনি। গাঢ় নিদ্রা আমাকে শান্তির কোলে টেনে নিয়েছিল।

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

পরের দিন সকালে কিন্তু মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণের মত মাটিতে শুয়ে আছি দেখতে পাইনি। হোটেলেই শুয়ে আছি দেখতে পেয়েছিলাম এবং সেখানেই দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ছিলাম। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাটাবার একটি কারণ ছিল। কয়েকদিনের পরিশ্রমে শরীর দুর্বল হয়। যখনই শরীর দুর্বল হত তখনই বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করত না। শরীরের দুর্বলতা সারাবার জন্য পূর্ণ বিশ্রামের দরকার হল। পূর্ণ বিশ্রাম পেতে হলে একটু পরিশ্রমও করতে হয়। মাথার নীচে বালিশ না দিয়ে সোজা হয়ে শুতে হয়। তারপর প্রখর দৃষ্টিতে নাকের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকলেই শরীরের দুর্বলতা কমতে থাকে এবং উঠে বসার প্রবৃত্তি হয়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মোটেই উঠতে নাই শরীরের যখন শক্তি ফিরে আসে তখন মোড় ফিরে আরও এক ঘণ্টা সময় শুয়ে থাকলে শরীরের দুর্বলতা দূর হয় এবং বাইরে যাবার প্রবৃত্তি আপনি আসে। এই নিয়মটি কিন্তু রোগীর প্রতি প্রযোজ্য নয়। এতে রোগী মারাও যেতে পারে।

পুণুম-পেণ হল কম্বোজের রাজধানী। সহরটি বেশ সাজানো। শহরের মধ্যে অনেকগুলি মন্দির এবং মন্দিরগুলির চারিদিকে ফল ফুলের বাগিচায় সমাকীর্ণ। হোটেলের দুতলাতে বসেই কয়েকটি দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল এখানে কয়েকদিন থাকলে ভাল হবে। অনেক কিছু জানতে সক্ষম হব। সেজন্য ইণ্ডিয়ানদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা হ'ল না, তারা আর্থিক সাহায্য বেশ করে কিন্তু ইচ্ছামত তাদের বাড়িতে থাকতে দেয় না। আমি যখন এসব কথাই ভাবছিলাম তখন একজন বেশ মোটা বোড়া মুসলমান পুলিশকে নিয়ে আমার রুমে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমারাই নাম রামনাথ হায় না?" অবনত মস্তকে আগন্তুকে বললাম—"হাঁ সাহেব চল তোমাদের বাড়িতে যাই। বোড়া লোকটি তৎক্ষণাৎ আমাকে নিয়ে চলল

বাজারের দিকে এবং তাঁরই এক আত্মীয়ের দোকানে থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়ে বললেন, "ইদারমেই তোমে ঠেরগে, সমজ, হামারা বহুত কাম হায়, এবি হাম চল্‌তাহে।"

বোড়া মুসলমান জাতে গুজরাতী। হিন্দুস্থানী খুব কমই বলতে পারেন। আমাকে আশ্রয় দেবার আগ্রহ তাঁর মধ্যে বেশি ছিল, কারণ তার সাক্ষাৎ বড় ভাই, এক কম্বোজের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, সেই কম্বোজের অপর মেয়েকে একজন হিন্দু বিয়ে করেন। হিন্দু লোকটির উপাধি পেটেল। এই পেটেলের সংগেই বাটাংবং এর পথে দেখা হয়েছিল এবং তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর অন্য কাজ ছিল, সেজন্য ভায়রা ভাইকে আমার থাকার একটা ভাল বন্দোবস্ত যাতে হয় সে কথা বলেই সকালবেলা পেটেল সাইগণ চলে যান। ভায়রা ভাইএর অনুরোধ রক্ষার্থে বোড়া সাহেব আমার অন্বেষণে বের হন্। অন্বেষণ করে যখন কোথাও আমাকে পাননি তখন পুলিশের সাহায্য নেন। বোড়া হলেন মুসলমান আর পেটেল হলেন হিন্দু কিন্তু তাদের মনের মিল্ দেখে আমাকে হয়রাণ হতে হয়েছিল। বোড়া সাহেব আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণে পেটেলও উপস্থিত ছিলেন। বোড়া জেনেছিলেন আমি মাছ মাংস খাই সেজন্য মাছ মাংসের ব্যবস্থা হয়েছিল। পেটেল নিরামিশ-ভোজী সেজন্য তাকে শুধু একটু দূরে বসিয়ে খেতে দেওয়া হয়েছিল। অপর দিন যখন পেটেলের বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল তখন বোড়া সাহেব সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন কারণ পেটেলের বাড়িতে বোড়া সাহেবের অখাদ্য কিছুই ছিল না। এদের মিলন দেখে আমি বড়ই আনন্দ পেয়েছিলাম এবং এঁদের জীবন যেন এমনি সুখে যায় সেজন্য প্রার্থনাও করেছিলাম।

বোড়া সাহেবকে পরের দিন বলেছিলাম, যদি দয়া করে তিনি

কম্বোজরাজের সহিত আমার দেখা করিয়ে দিতে পারেন তবে বড়ই বাতধি হব। বোড়া সাহেব আমতা-আমতা করে বলেছিলেন কম্বোজরাজ কম্বোজের রাজা নন্, ফরাসীদের হাতের পুতুল। ফরাসীরা তাঁকে যেমনটি নাচায় তিনি তেমনি নাচেন, অতএব এরূপ রাজার সংগে দেখা করার আবেদন করে নিজের কাণ নিজে কাটবার কোনও দরকার নাই। আমি বেশ ভাল করেই জান্তাম, গুজরাতীদের মধ্যে অনেকগুলি সৎগুণ আছে। দরকার হলে তারা শত্রুর ঘরে গিয়েও মিত্রতা ভিক্ষা করতে পারে, কিন্তু এহেন গুজরাতীর মুখে কম্বোজরাজের 'খোস-খবর' শুনে সেদিকে আর পা বাড়াই নাই।

বোড়া সাহেব বলেছিলেন চাঁদা উঠাবার ভার তিনিই নেবেন এবং নিয়েছিলেনও। তাঁর সংগে দু'একদিন চাঁদা উঠাতে গিয়েছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এখানে অর্থের অভাব হবেনা বুঝতে পেরে অন্যদিকে মন দিতে বেশ সময় পেয়েছিলাম।

চীনা হোটেল হতে গুজরাতী ব্যবসায়ীর বাড়িতে দেখতে পেলাম এদের নকর চাকর সকলই আনামিত। এরা কেউ আমাকে সুদৃষ্টিতে দেখেনি এমন কি যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই আমার মানিবেগ হতে টাকা সরিয়েছে। এদের এই কুব্যবহারে দুঃখিত হয়েছিলাম এবং কি করে এদের উদ্দেশ্য বুঝা যায় তার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমি এদের সংগে মিশতে সক্ষম হইনি।

ছোট ছোট কাফির দোকানে গিয়ে আনামিতদের সংগে কথা বলতে চেষ্টা করতাম। তারা আমার কথা বেশ বুঝত কিন্তু উত্তর দিত না। সময় সময় তাদের ভাষায় টিপ্পনি কাটত, তা আমি মোটেই বুঝতাম না। বুঝতে পেরেছিলাম আনামীতরা আমাকে যেরূপ পরিত্যাগ করেছে তেমনি পেছনও নিয়েছে। এদের পেছন নেওয়াতে আমি

একটুও ভীত হইনি কারণ পেছন দিক হতে ছোরা মারা যদিও একটা এদের অভ্যাস ছিল কিন্তু ফরাসী ক্যাথলিক মিশনারীদের অনুগ্রহে তারা এই বর্বর কার্যটি পরিত্যাগ করেছে। ফ্রেন্চ মিশনারীরা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছে, কর্শিকান্‌রা তাদের দেশ দখল করেছে, তাদের স্ত্রীলোক নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তাদের কুকুরের মত ব্যবহার করছে, এর সবই অন্যায়, তা'বলে মালয়দের মত কারো পেছন দিকে গিয়ে ছোরা মারা, কোনও স্ত্রীলোককে অত্যাচার করা, শিশু হত্যা মহাপাপের কাজ। এসব হতে বিরত থাকবে। যদি তোমরা পার বিদ্রোহ কর, কর্শিকান্‌দের তোমাদের দেশ হতে তাড়িয়ে দাও এতে আমরা একটুও দুঃখিত হব না।" কর্শিকান্‌দের তাড়াবার সময় যদি তোমাদের মনে হয় ফরাসী মিশনারীদেরও হত্যা করা দরকার তাও করতে পার কিন্তু পেছন দিকে ছুরি, নারী এবং শিশু হত্যা হতে বিরত থাকবে। এই ধরণের উপদেশ দিতে আমি স্বকর্ণে শুনেছি। এসব সুন্দর উপদেশ পাওয়া সত্বেও "এশিয়াটিক বার্বারিজম" লোপ পাচ্ছে না।

একদিন উত্তর ভিয়েতনামের একটি শহরে একজন ফরাসী মহিলা তাঁর তিনটি ছোট শিশু নিয়ে গাড়ি হতে নামতে পারছিলেন না। তিনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলেন। অনেক উত্তরের লোক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ সেই মহিলাকে সাহায্য করতে আসেনি। অবশেষে আমি গিয়ে তাঁর সাত বৎসরের মেয়েকে গাড়ী হতে নামালাম এবং পরে তার পাঁচ বৎসরের পুত্র ও দুমাসের কন্যা সমেত নামতে সাহায্য করলাম। আমার এই কাজটিকে উত্তর ভিয়েতনামের লোক খারাপ চক্ষেই দেখেছিল। অনেকে ফরাসী ভাষায় আমাকে গালি দিয়েছিল। এটা কি এশিয়াটিক বার্বরিজমের অংগ নয়?

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

ইন্দোচানে যতগুলি মিশনারীর সংগে দেখা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেয়েছি। তারা প্রত্যেকেই ফরাসী সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে লেকচার দিতেও শুনেছি। ইন্দোচীনের ফ্রেন্‌চম্যানদের বাক্য স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। তবে ভিয়েতনামীদের বেলায় সেই আইন প্রযোজ্য হত না। তাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করার পূর্বে একজন ফ্রেন্‌চম্যান এসে সংবাপপত্র পরীক্ষা করত এবং তার আদেশ পাবার পর সংবাদপত্র প্রকাশিত হত।

আনামিত এবং কম্বোজ নিয়েই পুনুম-পেন্ শহর। এখানে কারে সংগে আমার সম্পর্ক ছিল না বলে সময় কাটিত না। বড় বড় বাগানে, মন্দিরে এবং মাঠে গিয়ে সময় কাটাতাম আর দুঃখ হত, এত জনাকীর্ণ শহরে এসেও আমি একাকী। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগে যদিও আমার সম্পর্ক ছিল; যদিও তারা আমার জন্য প্রচুর টাকা চাঁদা উঠিয়েছিল তবুও তাদের সংগে আমার মনের মিল ছিল না। অবশেষে একদিন আমি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দিলাম, এখানে প্রায় সাত দিন কাটিয়েছি, বেশিদিন একস্থানে বসে থাকা আমার অভ্যাস নয় আগামী পরশু এখান থেকে বিদায় নেব। অনেকে বল্লেন "কেন এখানে অনেক কিছু দেখার আছে, তাই দেখে সময় কাটানো কি যায় না?" কিন্তু তারা জানতেন না পুরাতন পাথরের গাথুনির মধ্যে যে প্রাণ আছে সেই প্রাণের সন্ধান করতে ভ্রমনে বের হইনি। শ্যাম দেশে পৌছার পরই আমার মনের পরিবর্তন হয়েছিল পরের দিনটা অতিকষ্টে কাটিয়ে বিদায়ের দিন ভারতীয় ব্যবসায়ীর ঘর থেকে যখন বের হলাম তখন পেটেল এবং বোড়া সাহেব উভয়ে মিলে একখানা মোটরবাস ভাড়া করে আরও কয়েকজন ভায়তীয় ব্যবসায়ীকে

নিয়ে আমাকে আগিয়ে দেবার জন্য অগ্রসর হলেন। প্রায় চার মাইল পথ তাঁরা আমার সংগে এগিয়েছিলেন। আমি বাইসাইকেলের উপরে থেকেই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলাম। এদের বিদায় দিয়ে এত আরাম অনুভব করছিলাম যে একটা গাছের নীচে গিয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বেশ কতক্ষণ শুয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠেই মনে হল আনামিতদের ব্যবহারের কথা। মনটা বেশ বিমর্ষ হল এবং অভ্যাস মত সাইকেল চালাতে আরম্ভ করলাম। পথের দুদিকে নানারূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পেলাম কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্যগুলি দেখতে মোটেই ইচ্ছা হল না।

পথের দুপাশে ক্রমেই রবর বাগিচা দেখতে পেলাম। কোথাও নানারূপ খনিজ পদার্থের মাইন খোঁদা হচ্ছে। কোথাও জংগল কাটা হচ্ছে, আবার কোথাও বা কাজ আরম্ভের তোড় জোড় চলছে। মাইন্স্-এর কাজ চলছিল। পথে অনেক আনামিত কুলির সংগে সাক্ষাৎ হ'ল তারা সকলেই মাথানত করে আমাকে এড়িয়ে চলে গেল। কতকগুলি দক্ষিণ ভিয়েতনামীর সংগে দেখা হল তারাও মুখ ফিরিয়ে নিলে। এটাকেই বলে আসল নন্কোওপারেশন্।

দ্বিপ্রহরে যখন বেশ ক্ষুধা হল তখন সংগের রুটি মাখন খেতে ইচ্ছা হল না। একজন কম্বোজের বাড়িতে গিয়ে ভাত দিতে বল্লাম। লোকটা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল দেখে তার হাতে কুড়িটি সেন্ট দিলাম। টাকার কথা বলে এই প্রবাদটি সত্য। সে আমার সামনে অনেকগুলি ভাত এবং শুকনা মাছ এনে হাজির করল। আমিও মনানন্দে তাই খেলাম। বিদায়ের পূর্বে লোকটার হাতে আরও দশ সেণ্ট দিলাম। এতে লোকটা এত খুশী হল যে হাত উঠিয়ে আমাকে বার বার নমস্কার করলে।

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

সন্ধ্যার পূর্বেই বনম্ (Boncm) নামক স্থানে পৌছলাম। বনম্ প্রকৃত পক্ষেই একটি বনের মধ্যে অবস্থিত। বাসিন্দা প্রায় সকলেই আনামিত। এখানে অতি সামান্যই কম্বোজ বাস করে। প্রকৃতপক্ষে বনম্ দক্ষিণ ভিয়েতনামের একটি অংশ। বনম্ গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে মেকং নদী বয়ে গেছে, তবুও "সদাশয়" ফরাসী সরকার কোচিন চীনের একটি অংশ কম্বোজরাজকে দান করে তাঁর "কৃতজ্ঞতার" ভাজন হয়েছেন। মেকং নদীর পশ্চিমতীরবর্তী সমগ্র ভূমিখণ্ড শ্যামরাজ্যের ছিল। ঘরের শত্রু বিভীষণ ফরাসীদের ডেকে এনে শ্যামদেশটাকে দ্বিভাগ করেছে। পূর্বভাগ কম্বোজ রাজা ফরাসীদের অধীনে থেকে নিজে গ্রহণ করেছে এবং পশ্চিমভাগ বৃটিশ এবং ফরাসীরা শ্যামের রাজার অধীনে বাফার স্টেটের মত করে রেখে দিয়েছে। ফরাসীরা যখন শ্যামের পূর্বদিকের অর্দ্ধরাজ্য দখল করে নিল তখন বৃটিশও এক চোটে ত্রেংগানু, কেলেনতান, পারলিস এবং কেডা দখল করে নেয় শ্যামরাজকে বৃটিশ বলেছিল এই কয়টি স্থান তোমার কবল থেকে "মুক্ত করলাম, দখল করলাম না, আমারা যাদের মুক্ত করেছি তারা সকলেই মুসলিম। মুসলিমরা তোমার অধীনে থাকলে হাঁপিয়ে মারা যাবে।" শ্যামের রাজাও বুঝলেন এই দিয়েও যদি কোনমতে প্রাণটা বাঁচাতে পারেন তবেই রক্ষা। শ্যামের রাজা বৃটিশের কথায় কোন প্রতিবাদ করেননি। প্রতিবাদইবা কার কাছে করবেন?

বনম্-এ পৌছে একটি ছোট্ট আনাম হোটেলে স্থান নিলাম এবং রুমের ভাড়া আগেই চুকিয়ে দিলাম। এখানেও সেই একই ব্যবহার। হোটেলে পৌছবার পর হোটেলের বয় বাবুর্চিরা ভাল ব্যবহার করল না। আমিও নিকটস্থ রেঁস্তোরায় গিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে বিশ্রাম করে। শুইতে গেলাম। রুমে গিয়ে বসেছি এমনি সময় সাইকেলের

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

টায়ার ফেটে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। নীচে গিয়ে দেখলাম একজন ফরাসীর সাইকেলের টায়ার ফেটেছে এবং সে নিজেই সাইকেল মেরামত করতে লেগে গেছে। আমার সাইকেল অটুট অবস্থায়ই আছে।

লাহোরে একদিন ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেই সময় আমি ইউরোপীয় সভ্যতাকে একটু উচ্চে ধরে তুলেছিলাম। তারই জন্য বার লাইব্রেরীর বাইরে এসে দেখি আমার সাইকেলটি কে ফুটো করে দিয়েছে! নিদর্শন স্বরূপ পিনটিও টায়ারের মধ্যে লাগিয়ে রেখে গিয়েছে। ছিলাম আমি আর্য-সমাজের ধরমশালায়। বার লাইব্রেরী হতে ফিরে আসবার পর ধরমশালার রক্ষী আমাকে ধরমশালা পরিত্যাগ করতে আদেশ করেছিল। সেদিনই আমি কালীবাড়িতে চলে যাই এবং যে কয়দিন ছিলাম, কালীবাড়ির বাইরে সাইকেল নিয়ে বের হতাম না। সে হিসেবে আনামবা অনেক সভ্য যদি বলি তবে বোধ হয় কারো দুঃখ করার কিছুই থাকবে না।

যাহউক পুনরায় রুমে যখন আসলাম তখন হোটেল-বয় রুমে প্রবেশ করে আমার সংগে কথা বলতে চেষ্টা করল। সে আনামীত ভাষায় কথা বলছিল। আমি আনামীত ভাষার একটি কথাও জানতাম না। ইংলিশ, মালয়, শ্যাম, চীনা, এই কয়টি ভাষায় কথা বলার পরও লোকটি যখন আমার একটি কথাও বুঝতে চাইল না তখন আমি তাকে বিদায় করে দিয়ে শুয়ে থাকলাম।

ঘুম তখনও আসেনি। পাশের রুমে কতকগুলি লোক ভিড় করতে আরম্ভ করল। ক্রমেই তারা চিৎকার করে "ভিনো" নামীয় মদের বোতল নিয়ে বেশ হট্টগোল বাধিয়ে দিল। 'ভিনো' খেতে যদিও সুস্বাদু কিন্তু এর উগ্রতা এত বেশী যে দু-এক গ্লাস খাবার পরই

যে কোন লোক শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। মদ্যপায়ীরা নানা ভাষায় কথা বলছিল, মালয়, শ্যাম এই দুটা ভাষাই বুঝতে পারছিলাম, অন্যান্য ভাষা-গুলি আমার অপরিচিত ছিল। চীনারা মদ খেয়ে কখনও মাতলামী করে না। বুঝলাম এই আসরে চীনা নাই, আছে অন্যান্য জাতের লোক। আনামিত ভয়ানক "রিজার্ভ", তারা যেন কথাই বলতে চায় না। এদের নির্বাক হয়ে থাকাটাই ফরাসী মহলে আতংকের সৃষ্টি করত। আমি যখন অর্দ্ধনিদ্রিত তখন কে এসে আমার দরজায় ঠুকা দিয়েছিল, কিন্তু এমতাবস্থায় দরজা খুলে মাতালদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত হবে না ভেবে দরজা আর খুলিনি। তারপর ওদের সভা যে কখন সমাপ্ত হয়েছিল তার হদিস রাখিনি।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবামাত্র এক নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি হল। হোটেল বয় এসে নূতন করে রুমের ভাড়া চাইল। আমি বলতেছিলাম ভাড়া দিয়েছি, বয় বলছিল আমি যদি ভাড়াই দিয়ে থাকি তার রসিদ দেখাতে। রসিদ কোথায় রেখেছিলাম তা আমার মনে ছিল না। হঠাৎ মনে হল রসিদ পাসপোর্টের ভেতর রেখে দিয়েছি। বয়টিকে বল্লাম "আচ্ছা নীচে চল, ভাড়া যদি না দিয়ে থাকি তবে আবার দেব। আমাদের কথা হচ্ছিল মালয় ভাষায়। আগেরদিন এই বয়ই আমার কথা বুঝতে পারেনি বলে ভান্ করছিল। আজ সে চটপট মালয় ভাষা বলছিল দেখে আশ্চর্য অনুভব হচ্ছিল! হোটেলের নীচে এসে পাসপোর্টের ভেতর থেকে রসিদ বের করে তাকে দেখিয়ে বল্লাম, গতকল্য তুমি আমার কোন ভাষাই বুঝতে সক্ষম হওনি আজ আমার সকল ভাষাই বুঝ, ব্যাপারখানা কি হে? নিজেকে ভিয়েতনামী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না? তারপর এটাও যদি তোমাদের রাজনৈতিক উন্নতির একটা অংগ হয় তবে তোমরা রাজনীতিতে

কোনমতেই উন্নতি করতে পারবে না। লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুই বল্‌লে না।

সেদিনই বিকালবেলা যখন আর একটি ছোট্ট শহরে গিয়ে উঠলাম রুমের ভাড়া বাবত ষাট সেন্ট দিয়ে তখনই রসিদ নিয়ে পকেটস্থ করলাম। বয়কে বলে এক কাপ কাফি আনিয়ে খেলাম তার দামও ত্রিশ সেন্ট দিয়ে দিলাম। বিকালে একটি রেঁস্তোরায় খাবার খেয়েছিলাম সেজন্য এক পেসো ত্রিশ সেণ্ট হয়েছিল তাও দিয়ে এসেছিলাম। রুমে এসে ভাবলাম এবার দেখব ব্যাটারা কি করে আমার সংগে বদ্‌মাসী করে?

আমরা বড়ই ভাবপ্রবণ জাত। বিকালের দিকে একটি মন্দির দেখে যখন ফিরছিলাম তখন একটি মেয়েলোক আপন মনে গান গেয়ে ভিক্ষা করছিল। কেউ তাকে ভিক্ষা দিচ্ছিল আর কেউ দিচ্ছিল না আমিও সেই যুবতীকে কিছু ভিক্ষা দিয়েছিলাম। যুবতী আমাকে বিদেশী বুঝতে পেরেছিল এবং আমি কেন তাকে বেশি ভিক্ষা দেব না সেজন্য আমার পেছন ছুটছিল। যুবতীর দিকে আর ফিরে না চেয়ে নিকটস্থ একটি ফরাসী পুলিশকে সকল কথা খুলে বলতেই ফরাসী পুলিশের মুখ শুকিয়ে গেল। বুঝলাম আমি কিছু অন্যায় করেছি ফরাসী পুলিশ আমাকে কিছু না বলে, হোটেলে আসল এবং তার নিজের ভাষায় আনামদের কি বলে চলে গেল। যাবার বেলা আমাকে ইংলিশে বল্‌লে, মঁশিয়ে কাউকে রুমে প্রবেশ করতে দেবেন না, এমন কি বয়কেও চাবি দেবেন না। এরা আপনার অনিষ্ট করতে পারে। সন্ধ্যার পূর্বেই একটি আরব রেঁস্তোরায় খেয়ে নিলাম এবং রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে দৈনিক রোজ নামাচা লিখে শুয়ে থাকলাম। কতক্ষণ পরই ঘুমিয়ে পড়লাম এবং দিনের সকল কথা ভুলে গিয়ে

স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করতে আরম্ভ করলাম। সেরাত্রে নানারকমের খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলাম।

সকালের দিকে যখন গ্রাম ছেড়ে সাইগলের দিকে রওয়ানা হতে যাচ্ছি তখন হোটেল বয় তিন পেছোর (সারে চার টাকার সমান) একটি বিল হাজির করল। বিলটি দেখেই আমার বেশ রাগ হল এবং বয়টির নেকটাই টেনে বল্লাম এরূপ করে স্বাধীন হতে পারবে না, আমি তোমার মিথ্যা বিল দেব না, বুঝলে! আমি যখন চিৎকার করে ভিয়েতনামী বয়কে গাল দিচ্ছিলাম তখন একজন পেশোয়ারী পাঠান পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে কাছে আসলেন এবং বিষয়টা বুঝে তৎক্ষণাৎ নিজের পকেট থেকে বয়ের হাতে তিনটি পেসো দিয়ে আমাকে বল্লেন "কোথাও কোন গলদ আছে নতুবা এমন মিথ্যার সৃষ্টি হতে পারে না।

"অনুগ্রহ করে আপনার দোষ মোচনের চেষ্টা করবেন। আমার কোথাও যে দোষ তা খুঁজে পেলুম না। অবশেষে পাঠান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম আমার দোষটা কোথায় যদি দয়া করে বলে দিন তবে বাধিত হব। আজ আপনি বিপদ হতে রক্ষা করলেন, কাল সকালে কে রক্ষা করবে? পাঠান "খোদা হাফিজ" বলে চলে গেলেন। আমিও সেখানে দাঁড়িয়ে আনামদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে বিদায় নিলাম।

আকাশ পরিষ্কার

সোয়াই রিয়াং একটি ছোট্ট শহর। এখানে বিজলী বাতির ছড়াছড়ি দেখে বেশ আনন্দ হল। চীনা হোটেলও ছিল। সেজন্য তাড়াতাড়ি করে হোটেলে না গিয়ে একটা রেঁস্তোরায় বসলাম। রেঁস্তোরার মালিক চীনা। বয়, বাবুর্চি চীনা। মনের আনন্দে বসে যখন খাচ্ছিলাম তখন কতকগুলি লোক আমার সাইকেলের বাক্সে কি লিখা আছে তাই দেখছিল। অনেকে সাইকেলের মালিকের অনুসন্ধান করছিল। আমি যখন খাচ্ছিলাম তখন একটি আনাম যুবক আমার কাছে এসে বসল এবং এক টুক্‌রা কাগজে কি লিখতে লাগল। কাগজে লিখা হয়ে গেলে সে কাগজখানা আমার হাতে দিল। আমি তা পড়তে আরম্ভ করলাম। কাগজে লিখাছিল "পুনুম-পেনে যে বাড়িতে আপনি ছিলেন তারা কে? সেই বাড়িতে একটি যুবক যার বাবা ইণ্ডিয়ান এবং মা কম্বোজ সে আপনার কি হয়? সে কেন আপনাকে নিয়ে শহরে বেড়াত?

বিষয়বস্তু দেখেই বুঝতে পারলাম পুনুমপেনে আমি কার বাড়িতে এবং কিরকম লোকের সংগে থাকতাম। জবাব লিখে দিলাম, "হোটেল ঠিক করার পর, হোটেলে গিয়ে কথা হবে।" হোটেল আমাকে ঠিক করতে হল না, আনাম যুবক হোটেল ঠিক করল এবং খাবারের পর সেই আমাকে হোটেলে পৌছে দিয়ে বিনয়ের প্রাবল্য দেখিয়ে বিদায় নিল।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর চীনা যুবক রুমে প্রবেশ করে বল্‌লে, "আমি জাতে আনামিত দক্ষিণের লোক।" আপনার গমনাগমন অনবরত লক্ষ্য করে আসছি। যেদিন আপনি পুনুমপেনে

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

ইণ্ডিয়ানের বাড়িতে গেলেন সেদিন থেকেই বুঝে নিয়েছি আপনি অন্য ধরণের লোক। যুবকের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম "আমি এদেশে নূতন লোক, কে আপনাদের শত্রু এবং কে মিত্র তা আমার জানা নাই এবং জানবার সম্ভাবনাও নাই। যে ছেলেটি আমার সংগে বেড়াত, সে হল অর্দ্ধ ইণ্ডিয়ান। সে কি কাজ করে, আমি কিসে জানব বলুন? প্রায়ই তাকে দোকানে বসে থাকতে দেখেছি এবং ভেবেছি সেই হবে দোকানের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, তাকে কি করে অবিশ্বাস করতে পারি? তার প্রতি আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছুই আসে যায় না। আমাকে নির্যাতন করে আপনাদেরও কোন লাভ হবে না। আমি এদেশে এসেছি দেখবার জন্য, থাকবার জন্য নয়। নব্বই দিন মাত্র থাকতে পারব। এর বেশি থাকতে দেবে না। সাইগণে গিয়ে হয়ত আরও ত্রিশ দিন এদেশে থাকবার মেয়াদ বাড়াবার চেষ্টা করব। নব্বই দিন যদি আমি ইন্দোচীনের পথের পাশে শুয়ে থাকি তবে আমার শরীর ভেংগে যাবে না, কিন্তু আপনাদের সমূহ ক্ষতি হবে। আমি যেখানেই যাব সেখানে গিয়েই আপনাদের খারাপ ব্যবহারের কথা বলব। আর দুদিন পরই সাইগন পৌঁছব। সেখান থেকে হাইফং পর্যন্ত প্রত্যেক শহরে ভারতবাসী পাব। তাদের বাড়িতে থাকব আর আপনাদের বিরুদ্ধে যত পারি বই লিখার উপকরণ সংগ্রহ করব। এখন থেকে যদি আপনারা আমার সংগে ভাল ব্যবহার করেন তবে আপনাদের দেশ সম্বন্ধে একদিন যে বই লিখব তাতে প্রশংসাই থাকবে। আপনাদের যাতে ভাল হয় সেজন্য যত্র তত্র লোকের মনাবর্ষণ করব। মনে রাখবেন আমি পর্যটক আপনাদের সর্বনাশ করবার জন্য অথবা আপনাদের দেশের মাইল পোষ্টগুলি গুণবার জন্য আসিনি!

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

আমি দেখতে এসেছি, আপনারা কতটুকু উন্নতি করেছেন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে লড়াই করার জন্য কতটুকু শক্তিশালী হয়েছেন। আপনাদের সাহায্য না পেলে আপনাদের দেশের সকল কথা যেমন ভাল করে বুঝতে পারব না তেমনি বই লেখার সময় যদি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে দেই তবে আপনাদের মন্দ বই ভাল হবে না।

আনামিত যুবকআ ামার কথা বুঝল এবং খানিকের তরে চিন্তা করে বাইরে চলে গেল। যখন সে ফিরে আসল তখন তার হাতে একখানা কাগজ ছিল। কাগজখানা আমার হাতে দিয়ে বলল—"আপনি যখনই কোনও বিপদে পড়বেন তখনই এই কাগজ দেখাবেন যদি সে অনামিত হয় তবে আপনাকে সকল রকমে সাহায্য করবে কাগজখানা আপনার টুপির মধ্যে লুকিয়ে রাখবেন, কোনও ফরাস যেন না দেখতে পায়।

যুবক বলছিল গোপনীয় পত্রটি যে কোন আনামিতকে দেখাতে পারি। আনামিতদের মধ্যে ফরাসীদের নিযুক্ত কোনও গোপনীয় পুলিশ কি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু আনা। গোপনীয় পুলিশের প্রকৃতি অন্য রকমের। তারা পেটকাওয়াস্তে অথবা স্ত্রীর গয়ণা গড়াবার জন্য ফরাসীদের চাকরি করে না। তারা চাকরী করে বেঁচে থাকবার জন্য। তারা জাতের মংগলটা নিজের মংগল হতে বড় করে দেখে। সেই জন্যই "নিমকহালালী" করত না। আনামিতদের মধ্যে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকলের মন একই ছাঁচে গঠিত ছিল। সেইজন্য আজ মুষ্টিমের আনামিত সাম্রাজ্যবাদী ফয়াসীর সংগে একাই লড়তে ভয় করছে না।

আনামিতরা পুরাতন জাত কিন্তু তাদের মধ্যে হিন্দু অথবা মুসলিম ধর্মের ছাপ না পড়াতে এখনও তারা জাতের মর্যাদা ঠিক ঠিক ভাবেই

বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখনও তারা ব্যাক্তিগত আক্রোশ অথবা্য বক্তিগত স্বার্থ বড় করে দেখে না। তারা দেখে জাতের ভাল এবং মন্দ, সেজন্যই তারা টিকে আছে।

যেদিন শুনলাম আনাম কয়দীর সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন তাদের অন্যত্র না পাঠিয়ে মাথা কেটে ফেলা হয় সেদিনই বুঝলাম আনামিতরা কেন সত্যাগ্রহ করে না। সত্যকথা বল্‌তে কি ফরাসীরা মহাত্মা গান্ধির মত লোককে আতুর ঘরেই মেরে ফেলত। ভারতে যদি ফরাসী সাম্রাজ্য হ'ত তবে ভারতের জহোরলাল, চিত্তরন্‌জন জন্ম নিতেন বটে কিন্তু তাঁদের মৃত্যু কাজের সূচনাতেই হ'য়ে যেত। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদীদের সেদিক দিয়ে 'ধন্যবাদ পাবার দাবী রাখে।

ইন্দোচীনে অথবা চীন দেশে প্রগতিশীল যুবক যুবতীরা প্রায়ই তাদের সঠিক নাম বলত না সেজন্য কাউকে নাম জিজ্ঞাসা করতাম না কিন্তু আজ হঠাৎ ইচ্ছা হল যুবকের নাম জিজ্ঞাসা করি। যুবককে লক্ষ্য করে বল্‌লাম, "আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। আপনার কার্য্য পদ্ধতি দেখলেই মনে হয়, আপনি একজন সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক। সাধারণত, আমি কারো নাম জিজ্ঞাসা করি না, কিন্তু আজ হঠাৎ ইচ্ছা হল আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে। জানি আমি, আপনি ইচ্ছা করলেই যে কোন নাম বল্‌তে পারেন তবুও ইচ্ছা হয়েছে আপনার নাম জানতে। আপনার নাম বল্‌তে বাধিত হব।"

যুবক আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে বল্‌লে, "বুঝতে পেরেছি, আপনার মধ্যে দুর্বলতা ঢুকেছে। সে যা হউক আমার নাম নাং তে থান্‌ অহোয়া যখন যাবেন তখন আমার সংগে সাক্ষাৎ হবে। আমাদের জীবন পদ্ম পত্রের জলের মত। আনহোয়াতে আমি সোসিয়েল ডিমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারী। শুধু তাই নয় আমি বিবাহিত এবং আমার দুটি

পুত্র সন্তান আছে। আমার স্ত্রী ফরাসীদের জেলে আত্মহত্যা করেছেন এখন আমার পরিচয় বিশেষরূপেই পেলেন। মাত্র সেদিন আমি সিঙ্গাপুর হতে ফিরে এসেছি। আপনার নিশ্চয়ই কৌতুক হবে, কেন আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

সেখানে বৃটিশ, ডাচ্ এবং ফরাসী সংবাদপত্রসেবীদের এক সভা হয়। সেই সভায় ঠিক হয়েছে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতে রাষ্ট্রনৈতিক কোনও সংবাদ বিদেশে পাঠানো হবে না এমন কি কোনও বিদেশী নিজের ভাষায় কোনও সংবাদ যাতে না পাঠাতে পারে সেজন্য এখন হতেই গোপনে চিঠির উপর সেন্‌সর করা হবে। অতএব বন্ধু, স্বদেশে সংবাদ পাঠাবার সময় একটু ভেবেচিন্তে সংবাদ পাঠাবেন। যুবক সত্যকথা বলছিলেন তার প্রমাণ স্বদেশে এসেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার কয়েকখানা ডায়রী বাড়ীতে পৌঁছেনি এবং কয়েকটি যুবকের মৃতদেহের ছবিও পাঠিয়েছিলাম তাও উধাও হয়েছিল। নাংতে বলেছিলেন ফরাসী জেলের অতিরিক্ত কয়েদীদের গিলোটিনে দেওয়া হয়।

তাঁর কথাগুলি ভয়ের সঞ্চার করেছিল। ভাবলাম আমিই গিলটিনে মাথা নত করে বসে আছি। গিলটিনটা হঠাৎ আমার ঘাড়ের উপর পড়ল। এখানেই সব শেষ। ভয় একেবারে চলে গেল।

নাংতে বলেছিলেন আপনি আগামী কল্য এখানে থাকুন। গ্রাম ভাল করে দেখুন। কতক্ষণ পর আবার বল্লেন "হাঁ, কাল ত এখানে অনেক কিছু দেখতে পাবেন, দেখে যান আমরা কেমন করে শাসিত হচ্ছি।

গ্রাম আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগলো। সারি দিয়ে ঘর এবং ঠিক মধ্যস্থল দিয়ে চওড়া পথ চলে গেছে। পথের উপর কারো বাড়ি ঝুকে পড়ছে না। পথ এবং ঘরগুলির অবস্থিতি দেখলে গ্রাম্য লোকের মানসিক অবস্থা বুঝা যায়। সকলেই সকলের জন্য দরদ প্রকাশ করছে বলেই মনে হয়।

সকাল বেলা ঘুম ভাংবার পূর্বেই নানারূপ বেশু বেজে উঠল।

তাড়াতাড়ি বিছানা পরিত্যাগ করে রাজপথে দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী এমন কি শিশু পর্য্যন্ত পথের পাশে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। নব্বই বৎসরের এক বৃদ্ধকে পথের পাশে দাঁড়াতে দেখে দুঃখ হল।

বৃদ্ধের কোমরে লম্বা তরবারি বাঁধা। পোষাক জেনারেলদের মত। চোখের পাতা নেমে এসেছে। যৌবনে বৃদ্ধ ফরাসীদের সংগে যুদ্ধ করেছিলেন। আজ সেই বৃদ্ধই নতজানু হয়ে ফ্রেন্চ্ ম্যানকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য পথের পাশে দাঁড়িয়ে থরথরি করে কাঁপছেন। তাঁর বসবার জন্য কিছুই ছিল না। আধঘণ্টার বেশি দাঁড়াতে পারলেন না। মাটিতেই বসতে বাধ্য হলেন। ফ্রেন্চ অফিসিয়েলদের সামনে আনামিতদের হয় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নয় মাটিতে বসে থাকতে হয়। বৃদ্ধের দুর্দ্দশা দেখে হোটেলে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। বেলা নয়টার সময় পুনরায় যখন বেণ্ড বেজে উঠল তখন আবার পথের পাশে দাঁড়ালাম।

তিনটি মোটরকার ফরাসী পতাকা উড়িয়ে যখন আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল তখন কয়েকজন অফিসার, আমি এবং আরও কয়েকজন ফ্রেন্চম্যান্ ছাড়া সকলেই মাথা নত করে অভিবাদন করল। শুধু তাই নয়, যতক্ষণ মোটরকারগুলি তাদের সামনা হতে অতিক্রম না করে গিয়েছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা মাথা নত করেই ছিল। ফ্রেন্চম্যানরা আমার দিকে তাকাচ্ছিল আর আমি তাদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। নাংতে মাথা নত করেই আমি কি করছি দেখাচ্ছিলেন।

বিকালের দিকে নাংতের সংগে দেখা হবার পর তাঁকে বলতে বাধ্য হলাম, "আমাদের দেশের নেটিভ স্টেটগুলিতেও এরূপ দৃশ্য দেখা যায়। আপনাদের এতে লজ্জা করার কিছুই নেই। যে পর্য্যন্ত আপনারা স্বাধীন না হবেন সে পর্য্যন্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবেই। স্বাধীন হবার পরই আপনারা যেমন ভাবে আর্থিক উন্নতি করবেন তেমনি সামাজিক নিয়মগুলিও একেবারে পরিবর্তন করবেন। চীনারা তাদের বেণী কেটে ফেলেছে, বারবণিতাবৃত্তি সমাজ থেকে উঠিয়ে দিয়েছে এসব

বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন। নাংতে চিন্তিত মনে পাইচারী করতেছিলেন আর আমি বকে যাচ্ছিলাম কিন্তু কথার মত কথা একটাও বলছিলাম না দেখে নাংতে বড়ই দুঃখিত হয়েছিলেন।

পরেরদিন সকাল বেলা যখন হোটেল হতে বের হলাম তখন আর কেউ লম্বা চওড়া বিল নিয়ে আমার কাছে আসেনি। হোটেলের মালিককে ডেকে তাদের নিরিখ মত শাট সেন্ট (আমাদের দেড় টাকার সমান) দিয়ে বিদায় নিলাম। বিদায়ের সময় একটা গুরুতর ভুল করে বসি। রুটি কিনতে একেবারেই মনে ছিল না। শহর পার হয়ে হাইওয়েতে আসার পরও মনে হল না। আমার মনে শুধু নাংতের উপকারের কথাই মনে হচ্ছিল।

হাইওয়ের দুপাশে প্রথম কতকগুলি রবার বাগান পেলাম তারপরই একেবারে জঙ্গল। তবে এই জঙ্গল বড়ই সুন্দর, যেন সাজানো বাগান। বেলা দশটার সময় একটা বৃক্ষমূলে বসে বিশ্রাম করলাম এবং সামান্য জল খেয়ে তৃপ্ত হলাম। তার পরই বেশ তন্দ্রা এল, বৃক্ষের ছায়াতেই শুয়ে থাকলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা বারটা। পেটের ক্ষুধায় শরীর কাঁপছিল। সাইকেলের বাক্স খুলে কতকগুলি পুরাতন রুটি পেলাম, তাই জলে ভিজিয়ে খেয়ে পথ ধরলাম। বারটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত একটানা পথ চলে মানচিত্রে বর্ণিত একটি গ্রামে উপস্থিত হলাম।

গ্রামে ঘর ছিল কিন্তু মানুষ ছিল না। জলের পাতকূপ ছিল কিন্তু জল উঠাবার কোনও রসি এবং পাত্র ছিল না। ফলের গাছ ছিল কিন্তু ফল ছিল না। গৃহপালিত জীব রাখবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু কোনও গৃহপালিত জীব ছিল না। গ্রামের পাশেই আবাদ জমি ছিল কিন্তু জমিতে কেউ চাষ করছিল না। গৃহ-প্রাংগণের কাছে মরিচ, লাউ, বেগুণ এসব সবজির বাগান ছিল কিন্তু জলাভাবে সব শুকিয়ে গিয়েছিল। খাবার অন্বেষণ করতে গিয়ে প্রত্যেক ঘরে প্রবেশ করলাম

হয়েছিল। গ্রাম দেখে মনে হচ্ছিল গ্রামবাসীকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়ত গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়েছে। গ্রামের অবস্থা দেখে আমার ক্ষুধা লোপ পায়! ভাবতেছিলাম গ্রামের এমন দুর্দ্দশা হল কেন, গ্রামের এই দুর্দ্দশার কারণ কি? কোনও উত্তর না পেয়ে গ্রাম ছেড়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

আরও চার কিলোমিটার যাবার পর আর একটি গ্রাম পেলাম। গ্রামটি ছোট। আমাকে দেখেই গ্রামের লোকের মুখ শুকিয়ে গেল। শিশু খেলা বন্ধ করে মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় নিল। চৌদ্দ পনর বৎসরের বালক বালিকা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। বৃদ্ধেরা থরথর করে কাঁপতে লাগল। মা এবং বাবারা করজোড়ে মাথানত করে মাটিতে বসে থাকল। এদের এই দুর্দ্দশা দেখতে মোটেই ইচ্ছা করছিল না। টুপির ভেতর থেকে নাংতের দেওয়া কাগজখানা বের করে একটি লোকের হাতে দিলাম। সে কাগজ পড়ে মুখাকৃতি বদলিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে "ফেটিগী" অর্থাৎ বেশী পরিশ্রান্ত কি? প্রত্যুত্তরে তাকে ইংগিতে বললাম শুধু পরিশ্রান্ত নই, ক্ষুধার্ত।

লোকটি একটু চিন্তা করে বল্ল দুমাইল দূরে একটা হিন্দু পরিবার বাস করে, সেখানে গেলেই খাবার থাকার সুবিধা হবে। বিলম্ব না করে লোকটিকে নিয়ে হিন্দুর বাড়ির দিকে চল্লাম। হেটেই চললাম সাইকেলটি আনাম লোকটি ঠেলে নিয়ে যাওয়ায় আমার পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হয়েছিল।

হিন্দুর বাড়ীর চারিদিকে নানারূপ পত্রপুষ্প দিয়ে সজ্জিত ছিল। আঙ্গিনাতে গিয়ে দেখি একটি লোক নামাজ পড়ছে, অপর লোকটি পাকের বন্দোবস্ত করছে। আমাকে দেখামাত্র অপর লোকটি আমার সংগে তামিল ভাষায় কথা বল্ল। তার কয়েকটি কথা মাত্র বুঝতে সক্ষম হলাম। সর্ব্বপ্রথম আমি লোকটির সংগে হিন্দুস্থানীতে কথা বলি কিন্তু একটিও হিন্দুস্থানী কথা বুঝতে সক্ষম হয়নি। তারপর মালয় ভাষায় কথা বল্লাম তখন সে আমার কথার জবাব দিয়ে বসতে বল্ল।

যে লোকটি নামাজ পড়ছিল, সে নামাজ শেষ করে আমার কাছে আসল এবং জিজ্ঞাসা করল "আপনার কি অত্যধিক ক্ষুধা পেয়েছে ?" আমি বললাম, 'হঁা ভাই এত ক্ষুধা পেয়েছে যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মাথাটা গিড়্ গিড়্ করছে।' লোকটি তার ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললে, ভাত বসিয়ে দাও, সকালের তরকারি আছে। ছোট ভাইটি তৎক্ষণাৎ ভাত বসাতে গেল। ভাত পনর মিনিটের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে আমাকে খেতে বসাল। দুটি ভাই আমার কাছে বসে তৃপ্তির সহিত চেয়ে থাকল। তাদের সে চাহনি আজও মনে আছে। তাতে কত স্নেহ আর কত দয়া। তাদের সেই চাহনিতে কি ছিল আপনা হতেই বুঝতে পারছিলাম। মানুষের সংগে মানুষের যা করা কর্ত্তব্য দুটি ভাই আমার সঙ্গে তাই করেছিল। পেট ভরে খেয়ে তাদের আশীর্বাদ করলাম। তখন আশীর্বাদে বিশ্বাস করতাম। যদিও গোড়ামী ছিল না তবুও ঈশ্বর এবং অবতার বাদের প্রকট উপসর্গ ছিল।

খাবার পর ভাবছিলাম আজ যদি বাংলা দেশে শনি পুজার পূর্বক্ষণে কোনও মুসলমান আমার মত ক্ষুধিত হয়ে কোনও হিন্দু বাড়ীতে গিয়ে উঠত তবে তার কি অবস্থা হত! শনি ঠাকুরের ভয়ে আমরা এতই ভীত যে কি জানি কি অনিষ্ট হয় ভেবে মুসলমানটিকে হয়ত বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখতাম। শনি ঠাকুর, বৃহস্পতির বারবেলা এবং মঘা নক্ষত্র এসব হল আর্থিক দুর্বলতার সৃষ্টি।

যখন নিজের সমাজের কথা ভাবছিলাম তখন বড় ভাইটি আমার কাছে এসে বললে, "আপনি এখানে থাকলে কষ্ট পাবেন, চলুন অন্য বাড়িতে নিয়ে যাই। পাশেই একজন শিক্ষিত লোক আছেন। শিক্ষিত লোকটির বাড়ীতে যেতে পা উঠছিল না, কারণ এরই মাঝে ভারতীয় শিক্ষিতদের অনেক নমুনা দেখতে পেয়ে তাদের গা ঘেসতেও ইচ্ছা করত না। তবুও চলতে হল।

আমরা যে পথে চলছিলাম সে পথের দুদিকে সুন্দর সাজানো

ফুলের বাগান। ফুল নানা রকমের। গোলাপ, জুই, রক্তজবা, শ্বেত জবা, কাঠমালি গন্ধরাজ ইত্যাদি। ফুলের গন্ধে পথ আমোদিত ছিল। এমন সুন্দর পথে চলার সময় নিজের গ্রামের কথা মনে হচ্ছিল। বাস্তবিক জন্মভূমির মায়া এবং মোহ অসীম।

কতক্ষণ যাবার পর একটি বাংলো ধরণের বাড়ী দেখতে পেলাম। বাংলোর সামনে এক বয়স্ক ব্যক্তি ইজি চেয়ারে বসে ইজিপ্‌সিয়ান চুরুট টান্‌ছিলেন। আমাকে দেখামাত্র হয়ত পুলিশ ভেবেই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে আমাদের মতে নমস্কার জানালাম। তিনি আমাকে বারন্দায় উঠে বসতে বললেন। ইতিমধ্যে ছোট ভাইটি তাঁকে তামিল ভাষায় কি বলল। অভ্যাস বসে তিনি "ঐ ঐ" বলতেছিলেন। ঐ মানে হাঁ। শব্দটি ফ্রেন্‌চ। তারপর লোকটি চলে যাবার সময় আমাকে তামিল ভাষায় কি বল্‌ল। আমি তাকে করমর্দ্দন করে বিদায় দিলাম।

বৃদ্ধ গৃহস্বামী তামিল হিন্দু। ফরাসী ভাষায় তিনি বি, এ পাশ করেছেন। পণ্ডিচেরী তার জন্মভূমি। এ দেশে বহুপূর্বে এসে এক অনামিত রমণীর পানি গ্রহণ করেন। সেই রমণী একটি মাত্র পুত্র রেখে মারা যান। ছেলেটি এখন যৌবনে পদার্পন করেছে। তামিল বৃদ্ধ তাঁর ছেলের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। যুবক আমার সংগে করমর্দ্দন করে ফরাসী ভাষায় কি বল্‌ল। প্রত্যুত্তরে তাকে আমি ইংরেজীতে বললাম "আপনার বাবা ফরাসী প্রজা অতএব তিনি ফ্রেন্‌চ ভাষা শিখেছেন আর আমি হলাম বৃটিশ প্রজা সেজন্য আমি ইংলিশ ভাষা শিখতে বাধ্য হয়েছি। অতএব এখন আমরা অন্য কোন ভাষায় যদি কথা বলি তবে সুবিধা হবে।" যুবক তামিল জানত না। সে ফ্রেন্‌চ এবং অনামিত ভাষা জান্‌ত। সেজন্য তার সঙ্গে আমার কথা বলা সম্ভব হল না।

কতক্ষণ পর যুবক চলে গেল। সে তার বাবার বাড়ীতে থাকত না। পৃথক বাড়ীতে তার স্ত্রী পুত্র নিয়ে থাকত। পিতাই পুত্রকে পৃথক করে দিয়েছিলেন কারণ পুত্র অবাধ্য এবং স্বাধীনতা প্রিয়।

পুনুমপেনে যে ছেলেটি আমার সংগে চলাফেরা করত, সে কিন্তু অন্য ধরণের লোক ছিল। সে ইসলামে আস্থাবান। ফরাসী সরকারকে সাহায্য করার জন্য সি, আই, ডির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ইন্‌ফরমারের কাজ করত। এই যুবক ধর্মে আস্থাবান্ নয়, শুধু দেশের স্বাধীনতাই চিন্তা করত, এর একমাত্র কারণ হল সে প্রিভিলেড্ শ্রেণীতে থাকতে চাইত না। সরকার প্রিয় শ্রেণীতে থাকতে হলে ধর্মে আস্থা থাকা চাই, নিজের জাত ভাইকে অবহেলা করা চাই, এবং পারলে বিদেশী বলে পরিচয় দেওয়া আরও ভাল।

রাত দশটার সময় বৃদ্ধের সংগে খেতে বসলাম। এটা হল ফরাসী ধরণের খানা। সর্বপ্রথমই ছোট্ট একটি গ্লাসে ভিনো (Vino) এক রকম মদ দেওয়া হল। বৃদ্ধ গুড্‌লাক্ বলে গ্লাসটি এক নিশ্বাসে শেষ করলেন এবং পুনরায় গ্লাসটি পূর্ণ করলেন। আমি মাত্র এক চুমুক খেলাম। জানতাম যদি বেশী মদ খাই তবে আগামী কল্য পথে চলতে পারব না। মদে শরীর দুর্ব্বল করে। বৃদ্ধ অন্য গ্লাসটি শেষ করে ঘণ্টা বাজালেন। আমি তখন গ্লাসটি শেষ করে একদিকে ঠেলে রাখলাম। এর মানে হল, আর চাই না।

সুপ নিয়ে এল। সুপ যে কিসের দ্বারা তৈরী হয়েছিল তা অনুমান করতে পারলাম না। সুপ্ কিন্তু বেশ সুস্বাদু হয়েছিল। তারপর একঠার পর একটা করে নানারূপ মাছ মাংস আসতেছিল। পাঁচ রকমের খাবার খাওয়া হয়ে গেলে পুডিং আসল। পুডিং এর পর কাফি। ভাবছিলাম এখানেই শেষ। কিন্তু তা নয় সর্ব্বশেষে আসল আদার মদ্। সামান্য একটু করে ছোট্ট একটি গ্লাসে দেওয়া হল। এই ধরণের মদ খুবই ভাল, এই মদ খেলে রাত্রে কফে আক্রমণ করতে পারে না। বৃদ্ধের খাওয়ার পদগুলি বাস্তবিকই স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, বৃদ্ধ আর একটা চুরুট ধরিয়ে বসলেন এবং নানা রকমের গল্প করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর গল্পের মধ্যে একটি

গল্প আমার বেশ ভাললাগছিল। ইউনানের ইউনান্ ফোঁ নামক স্থানে তাঁর এক বাংগালী বন্ধু ছিলেন। তাঁর বন্ধু বৃটিশ সরকারের পক্ষ হতে ইউনান ফোঁতে কাজ করতেন। সেখানে তিনি অনেক বৎসর থাকার জন্য গণ্যমান্য চীনা রাজকর্মচারীর সংগে পরিচিত হন। চীন দেশে যখন প্রথম বিদ্রোহ হবে হবে করছিল তখন বৃটিশ অথবা অন্য কোন বৈদেশীক শক্তির কাছে চীন যে সত্বরই বিদ্রোহ করবে সে সংবাদটি গোপন ছিল। বিদ্রোহের এক মাস পূর্বে একদিন একজন চীনা রাজকর্মচারী বাংগালী ভদ্রলোককে তার ঘরে নিমন্ত্রন করেন এবং খাবারের শেষে বলেন যে "এমতাবস্থায় বাংগালী ভদ্রলোকের মাসেকের জন্য ছুটি নেওয়াই ভাল হবে।" বাংগালী ভদ্রলোক চীনা ভাষা এবং চীনাদের কথা বলার নিয়ম অবগত ছিলেন। সে জন্য তিনি বাংগালী প্রথায় 'এমতাবস্থাটা' যে কি তা জিজ্ঞাসা করে মুর্খত্বের পরিচয় দেন নাই। ঘরে এসে "এমতাবস্থা" কি হতে পারে তাই চিন্তা করার পর ঠিক করলেন "এমতাবস্থায়" চীন দেশ পরিত্যাগ করে ইন্দোচীনে একমাসের জন্য চলে যাওয়াই ভাল। কয়েকদিন পর চীনা রাজকর্মচারীকে তিনি তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং খাওয়া হয়ে গেলে রাজকর্ম্মচারীকে বলেন "এমতাবস্থায়" হানয় গিয়ে থাকাই ভাল মনে করি এবং সত্বরই ইন্দোচীনের হানয়ে যাচ্ছি। প্রত্যুত্তরে চীন কর্ম্মচারী বলছিলেন "অত্যুত্তম"। এর পর এঁদের মধ্যে আর দেখাশুনা হয় নাই। ছুটি শেষ হবার পর যখন বাংগালী ভদ্রলোক কর্মস্থলে ফিরে গেলেন তখন দেখতে পেলেন তার ভাড়াটে বাড়ীটিও কে বা কাহারা আগুন দিয়ে ধ্বংস করেছে। বিদ্রোহের জয় ডংকা তখনও উচ্চ নিনাদে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছিল। তখনও লোক বিদ্রোহের গান গেয়ে চীনাদের বেণী কাটার জন্য অনুরোধ করছিল। চারিদিকে নানারকমের বিদ্রোহ জাকিয়ে উঠছিল। বন্যার জলে যেমন আবর্জ্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঠিক সেই রকম চীনের সামাজিক দুর্নীতি, যা সুনীতি বলে চলে এক দিন গণ্য হত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিল।

যে জেনারেল বাংগালী ভদ্রলোককে বিদেশে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন সেই জেনারেলই বাংগালী ভদ্রলোককে পুনরায় থাকবার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। এত বড় একটা বিদ্রোহ হবার পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেউ জানত না চীনে বিদ্রোহ হবে। সেই বিদ্রোহের অনুযায়ী অন্য আর একটি বিদ্রোহ ইন্দোচীনে হবার সম্ভাবনা আছে। সেই বিদ্রোহ যাতে না হয় সেজন্য ফরাসী সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মাদ্রাজী বৃদ্ধ একটু দুঃখ করে বললেন "তাঁর ছেলেও যেন সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে। সে মদ খায় না, বেশী কথা বলে না, গ্রামের লোকের সংগে বড় বেশি মেলামেশা আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু গ্রামের লোকের সংগে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আমার ছেলে বলে এখনও ফরাসী সরকার তাকে ধরে নিয়ে যায় নি, অন্যের ছেলে হলে কোন্ দিন ধরে নিয়ে যমালয়ে পাঠাত তা কেউ জানত না।"

বৃদ্ধ শুইবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের দেশে কি সেরূপ বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে? বৃদ্ধকে কি জবাব দেব খুঁজে পাচ্ছিলাম না, কারণ আমাদের দেশের প্রত্যেকটী বিদ্রোহ পুলিশ ধরে ফেলেছিল এবং যারা তাতে লিপ্ত ছিলেন তাদের শাস্তি পাচ্ছিলেন।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বৃদ্ধ বললেন, "আমি সবই জানি প্রত্যেকটি বিদ্রোহী ধরা পড়েছে, প্রত্যেকটী বিদ্রোহী শাস্তি পেয়েছে, কিন্তু এদেশে তা হবার সম্ভাবনা নাই। অতি শিক্ষিত লোকও সাধারণের সংগে থেকে বৎসরের পর বৎসর গোপনে থাকতে পারে কিন্তু ভারতের শিক্ষিত সমাজ আত্মগোপন করতে পারে না। সাধারণের সংগে তাদের কোন সংশ্রব থাকেনা। শিক্ষিত লোকের সভাতে শিক্ষিতই যোগদান করে অন্যান্য লোক সেই সভার নিকটেও যায় না। "তামিল নাদ" বলে একটী দৈনিক সংবাদ পত্র সে কথাই প্রত্যেকদিন বলে আর আমি এতদূরে থেকেও তা পড়ে সুখী হই।"

বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুইতে যাই। পরের দিন ঘুম

থেকে উঠে বিদায় নিতে যাব এমন সময় বৃদ্ধ বললেন "মশিয়ে এখানে আজ থাকুন অনেক কিছু জানতে পারবেন। মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করে এবং কিলো মিটারের পোষ্টগুলি গুণে লাভ হবেনা।" বৃদ্ধের এই শ্লেষ বাক্য শুনে স্থান ত্যাগ করতে ইচ্ছা হল না। কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে সাইকেলটী সরিয়ে রাখলাম।

সকালের খাওয়া তৈরী হবার পুর্বেই বৃদ্ধের ছেলে আসলেন। বৃদ্ধ তাঁকে আনামিত ভাষায় কি বললেন। যুবক আমাদের একই সংগে সকালের খাবার খেয়ে আমাকে নিয়ে গ্রামে বের হলেন। সর্বপ্রথমই আমরা একটী বৌদ্ধ মন্দিরে যাই সেখানে বুদ্ধদেবের মুর্তিটি ভাল করে দেখে তার পাশে কি কি দ্রব্য আছে তার একটা লিষ্ট করে মন্দিরের বাইরের দিকে চলেছি এমনি সময় একটী যুবক বললে, "মশিয়ে ভূপর্যটক, এখানে একটু দাঁড়ান্ আমি আপনার জন্য কাফি নিয়ে আসছি। যুবক কাফি নিয়ে আসলে সকলে মিলে কাফি খেলাম এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করলাম। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন দুজন ভারতীয় অফিসার মন্দিরে এসে প্রবেশ করল। তারা ·ল্টনী লোক। উভয়েই ইংলিশ বেশ জানত।

একজন আমাকে বললে. "আনামিতদের সংগে কথা বলবেন না, এরা কি মানুষ? এই দেখুন এদের পোষাক। এরা শৌচকর্ম করে না।"

দুটা ভারতীয় অপগণ্ড ভাড়াটে সেপাইকে বললাম, "আপনারা যা বলছেন তার সবই ঠিক কিন্তু আমি অতি দরিদ্র ভারতবাসী। দরজায় দরজায় ভিক্ষা করে দৈনিক খাদ্যের সংস্থান করি। এরা যা করুক না কেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এখানে কয়েকটী মাস কোন রকমে কাটিয়ে যেতে পারলেই হল।"

সৈন্য বিভাগের অফিসারগণ আমার দিকে কতক্ষন তাকিয়ে শেষটায় বলল, "আচ্ছা আপনা পথ দেখো।" এদের দাম্ভিকতা দেখে মনে মনে একটু হাসলাম। তারপর তারা বুদ্ধদেবের মুর্তির পাশে

দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে বিদায় নিল। এরা চলে গেলে আনামিত যুবকদের কাছে এরা কি বল্‌ছিল তাই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল্‌লাম। যারা অপরের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে অন্তরকে কষ্ট দেয় তাদের মানুষ না বলে পশু বলাই দরকার, একথাটাও যুবকদের বলে ছিলাম।

যুবকগণ আমার সততা বুঝতে পেরে সুখী হয়ে মন্দির হতে গ্রামে নিয়ে যায়। আমরা গ্রাম্য মুদীর দোকানে গিয়ে সেখানে দেখলাম গ্রাম্য মুদী এক পেসোর জিনিষ বিক্রি করে তা হতে দশ সেণ্ট পৃথক করে রাখছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এটা হল স্মাল ট্যাক্স। এর মানেই হল শতকরা দশ পারসেন্ট সেল ট্যাক্স আনামিতদের দিতে হ'ত। একথাটা কোনদিন কারো কাছে দেশে এসে বলি নি, কি জানি আমার নূতন কথা শুনে আমাদের দেশেও সেল ট্যাক্স চালু করা হয়? যদিও আমি কথাটী গোপন রেখেছিলাম তাতে কিন্তু কাজ দেয় নাই। ভারতে স্যেল ট্যাক্স প্রবর্তন হয়েছে। এখন দশ পারসেন্টে উঠে নাই।

গ্রামের ঘরগুলি দেখলে মনে হয়না বাসিন্দা গরীব। কিন্তু তাদের ঘরে প্রবেশ করলেই দেখতে পাওয়া যায় দরিদ্রতা হাঁ হাঁ করে হাসছে আর গরীবদের শিশুগুলিকে টেনে নিয়ে তাদের রক্ত পান করছে। একেত আনামিতরা দুধ খায় না সেজন্য তাদের দেশে শিশুদের ভাতের মাই করে খেতে দেওয়া হয়। শিশুরা যদি ভাতের মাই না পায় তখন তাদের অবস্থা কি হয়? শিশুদের পবিত্র মুখের মিটে মিটে হাসি লোপ পায়, ক্ষুধায় কাঁদে তারপর আর কাঁদবারও ক্ষমতা থাকে না। তখন শুধু উপরের দিকে তাকায় আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা সেই মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য দেখে একটুও দুঃখিত হয় না। তারা ভাবে অনামিতদের আবার প্রাণ! এদের মরণ বাঁচন কশাইখানার জানোয়ারের মতই। এরা কি মানুষ? শাসিত এবং শাসকে এখানেই পার্থক্য। একে অপরকে মানুষ বলে স্বীকার করে নিতে রাজী নয়।

গ্রামের আভ্যন্তরিণ অবস্থা অবগত হবার পর মন আপনা হতে দমে গেল। যার শরীরে সামান্য দয়ামায়া আছে সেই গ্রামের দরিদ্রদের অবস্থা দেখে দুঃখিত হবে। মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মন হতেই কত রকমের প্রবোধ বাক্য আসত কিন্তু কোথাও শান্তি না পেয়ে অবশেষে পথ ধরাই ভাল হবে ভেবে, বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। বৃদ্ধ বললেন "বিদেশের দরিদ্রদের অবস্থা দেখে আপনার বৈরাগ্য হয়েছে, কিন্তু স্বদেশে ত সেরূপ বৈরাগ্য হয় না ? পাড়েয়াদের ছেলে মেয়ে না খেতে পেয়ে মরছে, উত্তর ভারতে এই গরমেও মেথরগণ পাতকূপের কাছে যেতে পারে না। স্বদেশের দুর্দ্দশা দেখে একটুও বৈরাগ্য হল না আর এদের দুর্দ্দশা দেখে বৈরাগ্য এসেছে, আমার মনে হয় আপনি সাইগণ চলে যেতে চান, গ্রাম দেখতে চান না।"

বাস্তবিক্ আমার মন সাইগণের দিকেই চলে গিয়েছিল। খাঁটি আনামিতদের দেখতে চাইছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধের ব্যংগোক্তি শুনে যাবার কথা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। দুপুর বেলা খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম করে পুনরায় গ্রাম দেখতে বের হলাম।

গ্রামগুলি আমাদের গ্রামের মত নয়। কারো পাঁচ সাতটা ঘর নাই। প্রত্যেকেরই একটি করে ঘর। ঘরগুলি লাইন করা। গ্রামের পাশেই পাতকূপ। পাতকূপ হতে জল উঠাবার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। কাপড় কাঁচা, জানোয়ারের জল খাবার জন্য খাল অথবা ডুবা রয়েছে। স্ত্রীলোকগণ ডুবাতে কাপড় কাঁচে। বর্ত্তমানে স্ত্রীলোক আত্মগোপন করে থাকতে ভালবাসে কারণ ফরাসী এবং ভারতীয় পুলিশ তাদের চুরি করে নিয়ে বিয়ে করে না অথবা আটকিয়েও রাখে না শুধু ধর্ষণ করে। এরূপ বর্ব্বরত্বের হাত হতে রেহাই পাবার জন্য স্ত্রীলোক একটু আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে।

আনামিত স্ত্রীলোক ফরাসী সেপাই অথবা দক্ষিণ ভারতীয় পুলিশকে যতটুকু ভয় না করে তার চেয়ে বেশী ভয় করে নিগ্রো সেপাইদের।

বাস্তবিক নিগ্রো সেপাইদের অত্যাচার অসহনীয় এবং অবর্ণনীয়। নিগ্রো সেপাইদের ছেড়ে দেওয়া হয় সেই গ্রামগুলিতে, যেই গ্রামগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়, যুবক যুবতী সমান তালে ফরাসীদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। পরের দিন যখন পথ দিয়ে চলছিলাম তখন দেখতে পাচ্ছিলাম কতকগুলি নিগ্রো সেপাই মোটর বাইক নিয়ে কোনও গ্রামের দিকে চলছে। এদের দেখেই মনটা কেঁপে উঠছিল। ভাবছিলাম এরা কাদের সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছে?

ভারতবাসী মাত্রেই অভ্যাসের দাস। যুবকগণ আমাকে তাদের কসাইখানা দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু কশাইখানা দেখতে রাজি ছিলাম না। যুবকগণ দেখাতে চাইছিল তাদের কশাইখানায় গত এক মাসের মধ্যে কোনরূপ জীবহত্যা হয় নাই এবং তাতেই প্রমাণিত হবে গ্রামের অবস্থা কত দুর্গত। যখন শুনলাম কসাইখানাতে এক মাসের মধ্যে কোনও জীবহত্যা হয় নাই তখন কশাইখানা দেখতে রাজি হলাম এবং কশাইখানা দেখে বুঝলাম গ্রামের অর্থাভাবের জন্যই কশাই জীবহত্যা বন্ধ করেছে।

কম্বোজ, লোয়াস, উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে কোনও জীবই হত্যা করা হউক, জীবের গলা পুছিয়ে কাটতে দেওয়া হয় না। হয় এক আঘাতে নয় মাথায় গুলি করে পরে পুছিয়ে অথবা এক আঘাতে রক্ত বের করে দিতে হয়। সেজন্য ভারতের মুসলমান ইন্দোচীনে মাংস খাওয়া একেবারে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। যখনই কোন গরু অথবা শূকর হত্যা করা হয় তখন একটা বন্দুকের মত অস্ত্র জীবটার মাথায় বসিয়ে দিতে হয়। এতে জীবটার জ্ঞান লোপ হয় এবং সেটাকে যে ভাবে ইচ্ছা কাটতে দেওয়া হয়। এটা হল ফরাসী আইন। আমাদের ভারতীয় মুসলমান সেই আইন অমান্য করতে একেবারে অক্ষম। আইন অমান্যকারীদের রাজদ্রোহে যারা দোষী তাদের মতই শাস্তি দেওয়া হয়। এর মানেই হল জেল হতে ফেরত আসাটা একটু আশ্চর্য্যের বিষয়

বৈ কি? ধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে এতটুকু অত্যাচার সহ্য করা বর্তমান যুগে সভ্য সমাজে পোশায় না বলেই ভারতীয় মুসলমানগণ জীবহত্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এতে আমার বেশ সুবিধা হয়েছিল। মুসলমানদের বাড়ীতে খেতে আমার কোনরূপ সংশয় থাকত না। তখন আমি সংশয়ের দাস ছিলাম।

গ্রামের অবস্থা ভাল করে দেখে আমরা একটি বাগানে গিয়ে বসলাম। বাগান আম অথবা কাঁঠালের নয়। ফল ফুলের বাগানও নয়। কতকগুলি জংলী গাছ মাত্র এবং তার তলাটা ছিল বেশ পরিষ্কার। লোকের চলাচল সেদিকে মোটেই ছিল না। বাগানে বসে আমিই বললাম, "আপনাদের দেশে যেমন বর্ব্বরতা চলছে পৃথিবীর কলোনিয়েল দেশগুলিতে সর্ব্বত্রই এরূপ অবস্থা। এই দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরতা হতে রক্ষা পাবার জন্য আপনারা কোন পথ অবলম্বন করেছেন? আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধির আদেশে যুবক যুবতীরা জেলে যাচ্ছে, মার খাচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, এই ত হল আমাদের সংবাদ। শুনতে পেলাম আপনাদের দেশে যারা জেলে যাচ্ছে তারা আর ফিরে আসছে না, তার কি প্রতিকার করছেন? একজন ভদ্রলোক বললেন, "আমরা কিছুই করতে পারছি না। তবে গ্রামে গ্রামে গুপ্ত ইউনিয়ন হয়েছে। শহরগুলিতে মজুরদেরও সেরূপই ইউনিয়ন হয়েছে এর বেশি কিছুই নয়। যারাই ইউনিয়নে যোগ দিচ্ছে এবং সেই সংবাদটি ফ্রেনচম্যানরা জানতে পারছে তাকেই তারা ধরে নিয়ে জেলে পুরছে এবং দরকার মনে করলে বিনা বিচারে গিলোটিনে দিচ্ছে তবুও আমরা দমে যাই নি, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি, এবং কাজ করে যাবও। এদের কথা শুনে সুখী হয়েছিলাম এবং পরের দিন মনটাকে বেশ হালকা করে পথে বের হতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ। বাইরের দিকটা দেখলে বৎসরকে ভাল ছাড়া মন্দ বলা চলে না। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করছিল। ভারতের কতকগুলি লোক জেলে আবদ্ধ হয়েছিল। জেলে গিয়ে তারা দুঃখে

ছিল না। যারা জেল আইন ভংগ করত তাদেরই একটু কষ্ট হত। যারা টেরারিস্ট রূপে পুলিশ হেপাজতে থাকত অথবা জেলে পাঠাবার সময় বড় বড় অপিসে আবদ্ধ থাকত তাদের প্রতি মারপিট হতো বটে কিন্তু প্রাণান্ত করা হ'ত না। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন ভারতে পৌঁছি তখন কতকগুলি Disable যুবক দেখে দুঃখ হয়েছিল ক্ষণেকের তরে মাত্র। যারা তাদের প্রতি অত্যাচার করেছিল তারা হল তাদের সমশ্রেণীর এমন কি স্বজাতীয়।

চীন দেশে তখন একটু মারপিট এবং সামান্য হত্যাকাণ্ডও চলছিল। পৃথিবীর লোক এই মারপিটের এবং সামান্য নরহত্যার সংবাদ রাখতে চাইত না। চীনারা আবার মানুষ? মরে মরুক, বাঁচে বাঁচুক, এই ভাবধারা নিয়েই সভ্য জগতের লোক চীনের কথা ভুলে যেত। এর বেশি পৃথিবীর বুকে আর ক্ষত কোথাও ছিল না বলেই সকলের ধারণা ছিল। ইন্দোচীন অথবা যাকে আমরা ভিয়েতনাম বলি তাদের কথা কেউ চিন্তাও করত না। যখন পৃথিবীর লোক ভিয়েতনামীদের কথা চিন্তাও করত না তখনই আমি ভিয়েতনামের অন্তস্থলে পৌঁছে ভিয়েতনামীরা কোন পথের পথিক তাই দেখছিলাম।

সকালে বের হয়েছি। পথে লোক চলাচল নাই। পথ বড়ই সুন্দর। মাঝে মাঝে এসপাল্‌ত যুক্তপথ ছিল। সাইকেলটা যেন নেচে নেচে এগিয়ে চলছিল। কতক্ষণ যাবার পরই একটি গ্রামে আসলাম। গ্রামে গিয়ে পথের পাশের দোকানে বসলাম। দোকানী খাবারের জল দিতে নারাজ ছিল। সংগের কাগজখানা বের করে তাকে দেখালাম এবং আমি যে ভিক্ষা করে প্রাণ ধারণ করি তার নিদর্শন স্বরূপ একখানা ভিক্ষা পত্রও দিলাম। দোকানী আমাকে জল খেতে দিল তারপর দোকানের দরজা বন্ধ করে আমাকে নিয়ে চলল তার বাড়ীতে।

যে ঘরটায় বসেছিলাম তার পাশের রুমে একটি স্ত্রীলোক প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছিল ভেবে দোকানীকে বললাম "আমি এখানে

কাফি পাবেন।” “রেঁস্তোরায় কাফি পাওয়া যায় সে কথা কে না জানে, কিন্তু এই যে কাফির গন্ধ আসছে তার গন্ধ আমাকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না।” তাই নাকি বলেই উভয় মহিলা ঘরে চলে গেলেন। আমি কিন্তু এক পাও নড়লাম না। কতক্ষণ পর একজন মহিলা এক পেয়ালা কাফি এনে দিলেন। কাফির পেয়ালা তার হাত থেকে নেবার সময় বার বার ধন্যবাদ জানালাম তারপর কাফিতে মুখ দিয়ে দেখি চিনি খুব কমই দেওয়া হয়েছে।

আভিজাত্য সম্প্রদায়ের নিয়ম হল, কাফিতে যদি কম চিনি দেওয়া হয় তবুও চিনি চাইতে নেই। ভাবলাম এবার কোন পথে? না, আভিজাত্য চাই না, চাই চিনি। মহিলা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, তাকে বললাম “আভিজাত্য চাই না চিনি চাই, চিনি নিয়ে আসুন।” মহিলা হাসলেন তার পর ঘর হতে তিন টুকরা চিনি এনে দিলেন। কাফির সংগে চিনি মিশিয়ে খেয়ে বিদায় নেবার সময় মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানে রাত কাটালে হয় না?”

এটা একটা সমস্যা। আর কেন বন্ধন? আধ মিনিটের মত চিন্তা করে শহরে পৌঁছে ছোট্ট একটি অনামিত হোটেলে স্থান নিলাম। হোটেলটি দেখেই সন্দেহ হল এখানে নানা রকমের কুকর্ম ঘটে। চিন্তা করার মত কিছুই ছিল না। সভ্যতার সংগে চাহিদা বাড়ে। চাহিদা মেটাতে অর্থাভাব হলেই মানুষ অপকর্ম করে। সভ্য হব, আভিজাত্যতা অর্জন করব, চাহিদা মেটাব অথচ অর্থাগমের পথ জানতে চাইব না। অর্থের অভাবের কথা উঠলেই বলব “এসব হল ঈশ্বরের ইচ্ছা।” এ সব ত চলে না। চাহিদা যখন বাড়ে, অর্থাভাব যখন হয় তখন বিজ্ঞান সম্মত আয়ের পথও জানতে হয়।

পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়েছিলাম। শুয়া মাত্রই চোখ দুটা বুজে যায়। রাত দশটার সময় ঘুম ভাংগে। তখনও শহর জাগ্রত।

মাতালের দল এক মদের দোকান হতে অন্য মদের দোকানে গিয়ে সময়ের সদ্‌ব্যবহার করছিল। আমিও ছোট্ট একটী চীনা খাবারের দোকানে বসে খাচ্ছিলাম। খাওয়া শেষ করে একটী কাফির দোকানে গিয়ে এক পেয়ালা কাফি নিয়ে বসলাম। যে সকল দোকানে শুধু কাফি বিক্রি হয় সেই দোকানগুলি আরও জঘন্য। এসব দোকানে পাপীরা ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসে। তাদের এজেণ্ট প্রকাশ্যে কথা বলে। যারা এসব ব্যবসা করে তারা হয় অতি দরিদ্র নয় তথাকথিত আভিজাত্যদের পরিবারের মা বোন। ভারতবর্ষে এখনও আভিজাত্য শ্রেণীর লোক এমন অধম স্তরে নেমে আসে নাই।

কাফির দোকানে বসে ব্যবসা দেখলাম অনেকক্ষণ তারপর হোটেলে এসে ডায়রী লিখতে আরম্ভ করলাম। অনেক বাজে কথা লিখলাম তারপরও যখন ঘুম পেল না তখন উঠে বসলাম এবং বাইরে মুক্ত বাতাসে অনেকক্ষণ পায়চারী করে শুয়ে থাকলাম। মালয়, শ্যাম এই দুইটি দেশ ভ্রমণ করার পরই মনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হচ্ছিল। তারপর যতই মানুষের দুঃখ এবং দৈন্যতা দেখতাম ততই মনে বৈরাগ্য হ'ত। বৈরাগ্য বাড়ত। ভক্তি এসে আশ্রয় করত। ভাবতাম এই ত আর কি, এবার মুখ্য পেতে আর কত সময়! মানুষ পাপ করে তার ফল পায়। কিন্তু যখনই ভিয়েতনামী যুবক যুবতীদের সংগে দেখা হত তখনই ভক্তি, পাপ, পুণ্য এসব চলে যেত। তারা বুঝাত এসব বাজে কথা।

এর কয়েক দিন পরই একজন শিক্ষিত ইংলিশম্যানের সংগে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলছিলেন "এশিয়াবাসীর মধ্যে যারা একটু বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী তারাই হাতে ক্ষমতা পেয়ে নিজের জাতের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে। অত্যাচারীত হয়ে সাধারণ লোক বিদেশীকে ডেকে এনে নিজের জাতভাই অত্যাচারীকে শাস্তি দেয়। ইউরোপীয়ানরা সেই সুযোগেই এশিয়াতে রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।"

দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও কোচিন চীন

পূর্বে যে ভূখণ্ডকে কোচিন চীন বলা হত বর্ত্তমান সেই ভূখণ্ডকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম বলা হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনাম বর্ত্তমানে স্বাধীন এবং প্রগতির পথে। বর্ত্তমান দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংগে আমার অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নেই।

আমি যখন কোচিন চীন ভ্রমণ করতে যাই তখন কোচিন চীন ছিল ফরাসীদের অধীনে। সাইগনে ফরাসী গভর্ণর জেনারেল বিপুল বিক্রমে ফরাসী রাজ্যের ধ্বজা উড়িয়ে কোচিন চীনা, আনাম, তংকিনিজ এবং কম্বোজদের উপর "রামরাজত্ব" চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই রামরাজত্ব দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সুখের বিষয় অতীতের সেই অভিজ্ঞতা পঁচে যায় নি, এখনও আমার কাছে তা টাট্‌কা। শুধু টাট্‌কা নয় পুরাতনের কি নূতন রূপ হতে পারে তাও কিছুটা অনুভব করতে পারছি।

কম্বোজ দেশের পূর্বদিকে কোচিন চীনের অবস্থিতি। কম্বোজ ভ্রমণ করার পরই সে দেশে প্রবেশ করতে হয়েছিল। কোচিন চীনের সর্বপ্রথম গ্রামের নাম হল **থেনিন্**। থেনিনকে যদিও আমি গ্রাম বলছি আসলে থেনিন একটি সহর। গ্রামকে উপলক্ষ করেই সহরের গঠন। সর্বপ্রথমই পেলাম গ্রাম। গ্রাম দেখে মনে হল এই গ্রামের সংগে কম্বোজের গ্রামের কোন সম্পর্ক নেই। এই গ্রামের গঠন অন্য ধরণের। এই গ্রাম গঠনের সংগে পূর্বভারতের গ্রাম গঠনের সম্পর্ক রয়েছে। ঘরের প্রস্তুত প্রণালী আমাদের মতই। আদীম যুগের ছাপ তাতে নেই। দু চালা চার চালা হরেক রকমের ঘর। ঘরের মেজে এক হাতের বেশী উচ্চ নয়। আমাদের গ্রামের সংগে পার্থক্য যা আছে তা অতি সামান্য। পুকুরের ব্যবস্থা সে দেশে ছিল না বর্ত্তমানেও নেই।

যে সকল দেশে পুকুর কাটার ব্যবস্থা ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে সেই দেশগুলিতে হয় বেগার প্রথার প্রচলন ছিল নয়ত সেই দেশগুলিতে পুঁজিবাদের চরম উন্নতি হয়েছিল। সুখের বিষয় কোচিন চীনে উভয় প্রথা অবর্ত্তমান থাকায় নানা দিক দিয়ে দেশের বৈশিষ্ট রক্ষা পেয়েছে। জাভানিজ্‌রা আরব সভ্যতার গোলামী মাথায় বয়ে কোচিন চীন আক্রমণ করেছিল, আরবগণ জাভানিজদের সাহায্য করেছিল কিন্তু সেখানে জনমত এক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের বালাই ছিল না। সেখানে যে যাই নিয়ে আসুক না কেন সবই খর্ব এবং ধ্বংস হয়। জাভানিজরা কোচিন চীনাদের কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। বর্ত্তমানে পলাতক জাভানিজদের বংশধর দু একটি গ্রামে দেখা যায়। তাদের অবস্থা বড়ই কাহিল যদিও তারা ফরাসীদের সাহায্যে কোচিন চীনাদের সমূহ ক্ষতির ফিকিরে আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আনামিতরা স্বাধীনতা পাবার চেষ্টায় ব্রতী হয় এবং স্বাধীনতা পেয়েছেও অনেকটা। ফরাসীরা মাইনোরিটি এবং মেজরিটি কথা দুটি কল্পনাও করতে পারে নি, কারণ এখনও আনামিতরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

থেনিনে সন্ধ্যার পর পৌঁছেছিলাম, তবুও লোকচক্ষু এড়িয়ে কোন লজিং হাউসে আশ্রয় নিতে সক্ষম হইনি।

হোটেলে পৌঁছে স্নান করে রেঁস্তোরায় খেতে গেলাম। অনেকগুলি লোক আমাকে ঘিরে বসল। একজন লোক সকলের হয়ে নানা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। প্রশ্নগুলি সবই রাষ্ট্রনৈতিক এবং বড়ই সুন্দর। এরূপ সুন্দর প্রশ্ন এখনও আমাদের দেশে শুনতে পাওয়া যায় না। অথচ তখন ছিল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ। যারা প্রশ্ন করছিল তাদের মধ্যে গোপনীয় পুলিশও ছিল। গোপনীয় পুলিশরা সকলের সামনেই তাদের পরিচয় দিয়েছিল। গোপনীয় পুলিশ আমাদের দেশের গোপনীয় পুলিশের হালচাল জিজ্ঞাসা করল।

ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর

উপর দিকে থু থু ফেললে যেমন নিজের মাথার উপর থু থু পড়ে ঠিক তেমনি নিজের দেশের পুলিশের বাহাদুরীর কথা বিদেশে গিয়ে বললে নিজের বদনাম বলতে হয় সেজন্য পুলিশের প্রতি এত ঘৃণা থাকা সত্বেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হলাম, অজুহাত দেখিয়ে বললাম যখন আমি খেতে বসি তখন শুধু খাবারের কথাই ভাবি। খাবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পুনরায় আমাকে একই প্রশ্ন করা হল। অবশেষে বলতে বাধ্য হলাম কলনিয়েল দেশের পুলিশ সর্বত্র একই ধরণের, মণিবের মনস্তুষ্টি করাই একমাত্র কাজ। যারা আমাকে ঘিরে বসেছিলো তারা বললে তা কি করে হয়? আমরা কখনও মনিবের সাহায্য করতে রাজী নই। সে জন্যই ইণ্ডিয়া, আফ্রিকা এমন কি চীনদেশ থেকে নানা রকমের পুলিশ এদেশে আমদানী করে ফরাসীরা শাসন কার্য্য চালাচ্ছে। এ সংবাদটিও কেউ আপনাকে দেয় নি?

না মহাশয়, আমি এ বিষয়ে এখনও বুঝতে সক্ষম হই নি। আপনাদের মত বন্ধু যদি না পেতাম তবে পথের মাইল পোষ্টগুলিই গুনতে হত, এর বেশি নয়।

যুবকগণ বললে, এখন আপনি আমাদের সংস্পর্শে এসেছেন, এতে আপনার মংগলই হবে। কাল এখানে থাকুন, স্থানীয় ধর্মমন্দির দেখে যান। ধর্মমন্দির দেখা ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। আপনাকে পুলিশ ষ্টেশনে যেতে হবেই, সেখানে ভিক্ষা চাইবেন, দেখা যাক পুলিশরা আপনাকে কত ভিক্ষা দেয়। আমি তাতে রাজী হলাম এবং লজিং হাউসে শুইতে গেলাম।

হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এদের মন্দিরের গঠন একই ধরণের কিন্তু বৌদ্ধ মন্দিরের গঠন একই ধরণের নয়। কোথাও পাগোডা, কোথাও মন্দির আর কোথাও পর্ণ কুটির। এখানকার মন্দির পাগোডা ধরনের। স্থানীয় স্থপতিবিদ্যার উন্মেষ হয়েছে মন্দিরের গঠনের ভেতর দিয়ে।

কোচিন চীনাদের গৃহকার্য্যের নৈপুণ্য রাজ বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় না, দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধ মন্দিরে। এদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তৃতীয় ত্রিপিটকের প্রভাব প্রবলভাবে বিকশিত হয়েছে। রাজাকে রাজ্য রক্ষক বলে স্বীকার করা হয় না। প্রজা বলে যে এক শ্রেণীর জীব পুঁজিবাদীদের দেশে দেখতে পাওয়া যায় সেই প্রজারাই ছিল কোচিন চীনের কর্ণধার। তৃতীয় ত্রিপিটকে সেই ভাব ধারারই লক্ষন দেখতে পাওয়া যায়। যার সাহায্যে এতবড় স্বাধীনতা আসে তাকে সম্মান করা সকলেরই কর্ত্তব্য মনে করে অতীতের আনামিতদের শুধু মন্দির গঠন নয় সমাজ সেবায়ও আত্ম নিয়ন্ত্রন করেছিলেন।

বৌদ্ধ মন্দির দেখার পর পাশের বাড়ীতে কয়েকজন ভিক্ষুর সংগে দেখা হল। তারা পালী ভাষায় পণ্ডিত। আমার সংগে তারা পালী ভাষায় কথা বলেন। পালী ভাষা যদিও আমার জানা ছিল না তবুও বাংলা ভাষার সংগে পালী ভাষার নিকট সম্বন্ধ থাকায় তাদের অনেক কথাই বুঝতে পেরেছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের জন্য আজ কোচিন চীনাদের মধ্যে যত সামাজিক উন্নতি দেখা যায় প্রাচ্যদেশে সেরূপ উন্নত অবস্থা আর কোথাও দেখা যায় না।

কোচিন চীনাদের প্রায় সকলেই প্রগতির পক্ষপাতী। তারা বেশ ভাল করেই অবগত আছেন, যদি তাদের মধ্যে কেউ দেশদ্রোহী থাকে তবে ফরাসীরা নিশ্চয়ই তাকে প্রশ্রয় দেবে। তাদের মধ্যে কয়েকজন যে ফরাসীদের অনুগত ভৃত্য যে ছিল না তা নয়। এই অনুগত ভৃত্যরা সুপরিচিত ছিল। কতকগুলি লোক যারা ধর্মটাকেই বড় করে দেখত তারাই দেশদ্রোহীর কাজ করত। ফরাসীরা এই দুষ্ট এবং বর্ব্বরদের সাহায্য করত। এরা ফরাসী সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে এতই আস্করা পেয়েছিল যে আইন বিরুদ্ধ কাজ করলেও তাদের শাস্তি হত না। ভাবছিলাম এ সব কথা চেপে যাব, কিন্তু ভারতে ধর্মের

গানে ছিল :—

বড় অবিচারে হইলরে ভাই ক্ষুদিরামের ফাঁসি
ও ভারতবাসী ভুলিবে কি প্রাণান্তে ?

সুবিচার আর অবিচার এ দুটি কথার সার্থকতা কে ঠিক করে ? যার হাতে শাসন করার ভার রয়েছে সে যদি কাউকে হত্যা করতে চায় তবে আইনের কোনও দরকার হয় না, হত্যা করলেই হল। কিন্তু লোক দেখানো আইন আছে। যারা শাসন করে তাদের নিজের দরকারেও সেই আইনের দরকার হয়। সেজন্যই যাকে হত্যা করা হবে তাকে আইনের কাঠগড়ায় হাজির করা হয় এবং তার পরই হত্যা। কবি ততদূর অগ্রসর হন নাই বলেই "অবিচার" বলেছেন। যারা সাম্রাজ্য-বাদী তাদের কাছে সুবিচার আর কুবিচার বলে কিছুই নাই।

আমি যখন গান গাচ্ছিলাম তখন একজন ভিক্ষু আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভিক্ষুকে দেখামাত্র গান বন্ধ করলাম। ভিক্ষু আমাকে গান গাইতে বললেন। ভিক্ষু জানতেন না আমি গায়ক নই। নিজের খুসিমত মুখ হতে রাগিনীর সাহায্যে যা বেড়িয়ে আসত তাই ছিল আমার গান।

ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনারা শুধু নির্বানের কথা বলেন, কিন্তু ফরাসীরা তা বলে না অথচ আপনাদের দেশবাসীদের নির্বংশ করার উপক্রম করেছে তার জন্য কি করছেন ? আমাদের দেশে এই একই প্রশ্ন, যদি কোন সাধুকে জিজ্ঞাসা করতাম তবে সে উত্তর দিত "ঈশ্বরের ইচ্ছা" কিন্তু ভিয়েতনামী সাধু সেরূপ কিছুই বলেন নি তিনি শুধু চুপ করে রয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তার বলার মত কিছুই ছিল না। প্রতিকার করার যার কোন শক্তি নাই, তার কিছু বলারও অধিকার নাই।

বৌদ্ধ মন্দিরে বেশীক্ষণ না বসে হোটেলে এসেই দরজা লাগিয়ে

শুয়ে পড়লাম কিন্তু শুয়ে থাকতে সক্ষম হলাম না। যুবকের দল আসল এবং নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ করল। গিলটিন কেমন? গিলটিনে কত ধার আছে ইত্যাদি। এদের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছিলাম। যারা আমাকে গিলটিন দেখাতে নিয়ে গেল তারা গিলটিন সম্বন্ধে কিছুই জানে না, সে কেমন কথা? জিজ্ঞাসা করে জানলাম, যারা গিলটিনে গিয়ে মরে তারাই গিলটিন দেখে আর কেউ সেই জঘন্য যন্ত্র দেখতে চায় না। বড় সুন্দর কথা। আমরা ফাঁসি-কাঠের কথা নানা মতে বলে সুখী হই আর এরা যেদিনে গিলটিন হয় সেদিনই গিলটিনের কথা ভাবে। এদের কথার বাহুল্য দেখে গিলটিন সম্বন্ধে সকল কথা বন্ধ করে দিলাম এবং এই কথাটা একেবারে পরিত্যাগ করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম "মশিয়ে আপনারা এত ভাল করে ইংলিশ ভাষা কোথা হতে শিখলেন।"

একটি বিশিষ্ট যুবক বল্লে "আমরা ইংলিশ শিখি আমাদের বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে। ইংলিশ ভাল করে আয়ত্ব করা এদেশে বে-আইনী সেজন্য এই ভাষাটা আমরা বেশী শিক্ষা করি।"

তারপর উঠল শ্যামদেশের কথা। এদেশের লোক যাতে বেংককে না যেতে পারে সেজন্য ফরাসী সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু এদেশ থেকে যত লোক বেংককে যায় কম্বোজ থেকে তত লোক যায় না। কম্বোজরা রাজতন্ত্রী কিন্তু ফরাসীরা তাদের রাজার কর্ণ মর্দ্দন করে সে কথা তারা বুঝতে নারাজ। অনেকে হয়ত বলতে পারেন বেংককের রাজাও একজন স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁর কথাই সেখানে আইন। তবুও আমরা সেখানে যাই কেন এবং সেখানে গিয়েই বা কি করি?

যদিও বেংককের রাজা স্বেচ্ছাচারী তবুও তিনি বিদ্রোহী। ফরাসী এবং বৃটিশ তাকে সুনজরে দেখে না। তাঁর রাজ্যের বাহির হতে যে কোন বিদ্রোহী সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। যার রাজ্যে

বৈদেশীক বিদ্রোহীরা আশ্রয় পায়, তিনি কাগজে পত্রে স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন কিন্তু সর্বসাধারণ তাঁকে সাধারণ মানুষরূপেই গণ্য করে। শ্যামদেশের যে কোন স্থানে বসে যে কোনও বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু এদেশে আমাদের সে অধিকার নাই। সেজন্য আমরা বেংককে যেতে ভালবাসি। তাদের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম এখন আমি জানতে চাই সেজন্যই কি আপনারা ফরাসীদের সংগে একেবারে পরিত্যাগ করেছেন? তাদের ভাষা, তাদের আচার ব্যবহার এসব জানাও কি অন্যায় মনে করেন?

না মশিয়ে, এ সম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই বলব না, আপনি সাইগন আগামী কল্য পৌঁছবেন, সেখানে মশিয়ে পারেয়ারী বলে এক ভদ্রলোক আপনার সংগে দেখা করবেন। তিনি বলবেন আমরা কেন ফরাসীদের কাছ থেকে দূরে থাকি।

সাইগণ

সকাল বেলা আকাশ পরিষ্কার ছিল কিন্তু দশটা বাজার কিছু পূর্ব হতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করল: বিপদ গন্‌লাম্ না, আরাম পাব বলে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকলাম্। পথের দুদিক পরিষ্কার। কখন বা একখানা ছোট গ্রাম আর কখন বা ছোট রবরের বাগিচা। এদিকে রবর বাগিচা সবেমাত্র পত্তন আরম্ভ হয়েছে। বারটার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। বৃষ্টিকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য মাথা হতে টুপিটা খুলে ঘাড়ের দিকে ঝুলিয়ে রাখলাম। ধারে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। এসপাল্‌ত করা পথের উপর দিয়ে সাইকেল ফন্ ফন্ করে চলতে লাগল। সকাল হতে বিকাল পর্য্যন্ত একটানা সাইকেল চালিয়ে বেশ পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম সেজন্য বৃষ্টি বন্ধ হবার পরই পথের পাশের একটি রেঁস্তোরাতে ঢুকে পড়লাম।

এটা হল আনামিত রেঁস্তোরা। এই ধরণের রেঁাস্তোরার বিশেষত্ব আছে। খাদ্যদ্রব্য বড়ই সস্তা এবং কাফি ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যের বিষয় রেঁস্তোরাতে ফাউলকারী এবং ভাত বিক্রি হচ্ছিল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাই খেয়ে একটি বেঞ্চে শরীরটাকে বিছিয়ে দিয়ে কতক্ষণ বিশ্রাম করে আবার শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। বৃষ্টির জল পথের দুপাশে জমা হয়ে রয়েছিল। সেই দৃশ্য দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম কিন্তু ভিজা কাপড়ে আনামিতদের পথে চলতে দেখে দুঃখ হচ্ছিল। অনেকের পাতার ছাতা কেনারও ক্ষমতা ছিল না।

শহরের কাছে এসেছি। দোকানের সারি দেখে মনে হচ্ছিল শহরের অন্তস্থল বোধহয় অতি কাছে, কিন্তু তা নয়। দোকানগুলি প্রায়ই আরবদের। আরবগণ আলজিয়ার্স হতে এখানে এসে ব্যবসা

আরম্ভ করেছে। এরা মিশ্র জাতি। আরব এবং নিগ্রোর সংমিশ্রণে এদের জন্ম হয়েছে। এদের একটি মাত্র রীতি অথবা নীতি পালন করে চলতে হয়। সেটা হল ইস্‌লাম ধর্মের নিয়মকানুন মেনে চলা এবং ইস্‌লাম প্রচার। এরা এতেই সন্তুষ্ট। একটি দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানকার হিন্দুরা কোথায় থাকে? লোকটি বল্‌লে তারা থাকে শহরে, এখান থেকে অন্তত দুই মাইল হবে। তারপরই সে আমাকে তার ঘরে বসতে বলল। আমি তার ঘরে বসলাম এবং দেখলাম ঘরের দেয়ালের চারদিকে আরবী অক্ষরে লিখা কতকগুলি কাগজ কাঁচ দিয়ে বাধিয়ে দেওয়ালে টাঙ্‌গিয়ে রেখেছে। বুঝতে বাকি রইল না এসব হল কোরাণের শ্লোক বা বয়েদ! এসব দেখার পরই মনে যেন কি একটা আঘাত লাগল। আলজিয়ার্স দেশে ফরাসীরা আরবদের প্রতি প্রবলভাবে অত্যাচার করছে এবং সেই দেশেরই লোক মরনের পর স্বর্গে যাবার জন্য ধর্ম-কর্মে মন সন্নিবেষ্টিত করে রেখেছে। আলজিয়ার্সদের দুর্গতির কথা এদের মনেও কি স্থান পায় না?

অর্দ্ধ আরবের ঘরে ভাল করে বসবার পর সে আমার ধর্মের সন্ধান নিল। আমি তাকে জানালাম আমার ধর্ম "হিন্দু ধর্ম"। আমার কথা শুনে লোকটি স্তম্ভিত হয়ে বল্‌ল "তা কখনো হতে পারে না" হিন্দুরা জানে শুধু টাকা রোজগার করতে, হিন্দুদের মধ্যে কোনও মুসাপীর ছিল না এবং হবেও না। আরবদের মধ্যে হাজার হাজার মুসাপীর ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাদের "সফরনামা" সর্বসাধারণের পাঠ্যবস্তু। আপনি বলুন ত একটি হিন্দুর নাম, সে যে ধর্মের হউক, একখানা সফরনামা লিখেছে? উপরন্তু আপনার মুখে যে আভা দেখা যাচ্ছে তা শুধু মুসাপীরদের মধ্যেই থাকে। আপনি নিশ্চয়ই আরব, আমার কাছে ছলনা করছেন। আরব লোকটির মন্তব্য শুনে অবাক হলাম। আমি তাকে কিছুই বলতে সক্ষম হয়নি,

বিদায়ের সময় শুধু বলেছিলাম আলেকুম্ সালাম অর্থাৎ "আমার প্রতি ঈশ্বর যেমন দয়া রেখেছেন তোমার প্রতিও সে রূপ দয়া রাখুন"। তারপরই আবার পথে আস্লাম। পথে এসে ভাবতেছিলাম আমার মুখে এমন কি আভা বের হয়েছে যা শুধু পর্য্যটকদেরই থাকে? এসব চিন্তার মধ্যদিয়ে ধর্মগুলির উপর একটা বিতৃষ্ণতার ভাব ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল। কেন যে ধর্ম্মগুলিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করছিলাম তার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম বটে কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করার সুযোগ পাইনি। যেদিন মসিয়ে পারেয়ারীর সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেদিন আমি তাঁর কাছে এসম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম এবং বেশ শান্তিও পেয়েছিলাম।

পথে আসার পর মনে যেন একটা আগুন জ্বলে উঠল। এই আগুনের কারণ শুধু পরাধীনতার যন্ত্রনা। তখনকার দিনে আমার ধারনাছিল স্বাধীন হলেই সকল দুঃখের অবসান হবে। আমার এই মত পরে পরিবর্ত্তন হয়েছিল। পরিবর্ত্তন তখনই আসে যখন মানুষ ধাপে ধাপে শিক্ষাস্তরের উচ্চ বেদীতে উঠতে থাকে। আমার শিক্ষা ছিল সামান্য। আমি ভাবতাম বেশ বড় একটা ডিগ্রী না পেলে শিক্ষার স্তরে উঠা যায় না। পরে আমার এ ধারণাও চলে গিয়েছিল কারণ এমন অনেক লোক দেখেছি যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রী পাবার পরও গোমুর্খই থেকে যায়।

পথ চলেছি ত চলেছিই। ডান বা দেখার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। হঠাৎ একজন পুলিশ পথের উপর দাঁড়িয়ে বিপদ সূচক সংকেত দেখাল। আমি তার কথা অমান্য করে এগিয়ে চল্লাম। আনাম পুলিশ হাসতে আরম্ভ করল। আমি কিন্তু তার হাসিভরা মুখের দিকে তাকাই নি। যখন সে বিপদ সংকেত করেছিল এবং তার আদেশ অমান্য করে অগ্রসর হয়েছিলাম আমি তার সেই মুখের ছবির

কথাই ভাবছিলাম। মানুষ যখন কোনও বিভৎস দৃশ্য দেখে এবং তখন তার মুখের যে অবস্থা হয় আনাম পুলিশটিরও সেই অবস্থা হয়েছিল। সুখের বিষয় আমি জলে পড়ে হাবুডুবু খাইনি এমন কি কাধে ঝোলানো সোলা হেট্‌ও জলে ভিজে নি। জল থেকে উঠে শরীর মুছলাম না। সাইগণের প্রসিদ্ধ বেচাকেনার স্থানের দিকে অগ্রসর হলাম।

কতক্ষণ যাবার পরই একটি সিদ্ধি কর্মচারীকে বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দোকানের মালিক কোথায় আছেন যদি বলে দেন তবে বড়ই বাধিত হব।

লোকটি দোকানের মালীকের সংবাদ দেবার পূর্বেই জিজ্ঞাসা করল, "কব আয়া?"

আমি বললাম, "এইমাত্র এসেছি।"

আমার কথা শেষ হবার পরই লোকটা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল,— "কব্ যাওগে?"

এখানে কয়দিন থাকব সে কথাটীর নামটিও নেই উপরন্ত জিজ্ঞাসা করল, কখন যাব। যেন আপদ বিদায় হলেই বাঁচে। দোকান-কর্মচারীকে বললাম,—"কবে যাব সে কথা তোমার জানবার দরকার নাই, আমার যেদিন ইচ্ছা হয় সেদিন এখান থেকে যাব।" তারপরই মুখ ফিরিয়ে আবার পথে আসলাম এবং ডাইনে বায়ে লক্ষ্য করে চল্‌তে আরম্ভ করলাম। এমনি সময় একজন যুবক, ধর্মে মুসলমান জাতে বোরা, আমাকে লক্ষ্য করে ডাকল। আমি সাইকেলে বসেই জবাব দিলাম, "আপনিও হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন,—কব্ যাওগে" অতএব কাছে গিয়ে আর দরকার নেই।

লোকটি কিন্তু নাছুড়বান্দা। সে আমার পেছনে লোক পাঠিয়ে দিল। তাঁর লোক আমাকে পথ থেকে এনে বসতে দিল এবং কোন কথা না জিজ্ঞাসা করেই এক পেয়ালা কাফি খেতে দিল। তারপরই

ফোনে কথা বলে একটি হোটেল ঠিক করে যুবক বললে "এখন তুমি হোটেলে যাও, খাবার সময় হলে ডাকব।"

যুবকের ব্যবহারে আমার মাথা নত হয়ে আসল। আমি হিন্দু, সে মুসলমান, আমি বাংগালী, সে গুজরাটী। আমার প্রতি তার এত দয়া দেখাবার কারণ কি? দুষ্ট মন প্রত্যেকটি বিষয়ের কারণ খুঁজে বের করতে চায়। হোটেলে যাবার পথে যুবকের ছোট ভাই আমাকে পথ দেখিয়ে চলল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "ভাই বলত আমার প্রতি তোমাদের এত দয়া দেখাবার কারণ কি? দেশে হিন্দু মুসলমান কিরূপ অসৎব্যবহার চলেছে তা তোমার হাত দেখেই বুঝতে পারছি।" ছেলেটির হাতে এক জন হিন্দু দা দিয়ে আঘাত করেছিল। ছেলেটি হাতখানা লুকিয়ে রেখে বললে "এর কারণ আছে, চল হোটেলে যাই, তুমি কাপড় বদলাও তারপর কথা বলব। আমরা হোটেলে গিয়ে সব চেয়ে ভাল একটি রুম নেই এবং ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে স্নান করে আসি। স্নানের পর বস্ত্র পরিবর্ত্তন এবং তারপরে নিকটস্থ রেঁস্তোরায় গিয়ে কিছু খেয়ে দুজনে যখন রুমে বসলাম তখন ছেলেটি বললে "আমরা আজাদ পার্টির লোক সেজন্যই তোমার নাম্ ধাম না জেনেই সাহায্য করতে অগ্রসর হচ্ছি।"

আমি তখন আজাদ শব্দের অর্থ জানতাম না সেজন্য জিজ্ঞাসা করলাম, "আজাদ মানে কি?"

ছেলেটি বললে "স্বাধীন" স্বাধীনতা এক রকমের নয় মনে রেখো। আর্থিক, সামাজিক, ও নৈতিক ইত্যাদি।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধর্মের কথা বল নাই কেন?

এসব বাজে কথা নিয়ে আলোচনা করি না, এতে দুঃখ হয়। ধর্মের লড়াই আমাদের নির্ব্বংশ করতে চলছিল, আবার সেই ধর্মের কথা আর আমাদের মুখ দিয়ে বের হবে না। যার প্রভাবে মানুষ মানুষকে পশুর

মত হত্যা করতে পারে তাতে আমরা আর থাকব না। অত্যাচারীত হয়ে অনেকে ধর্মকে আকড়িয়ে ধরে, আমরা তা মোটেই পছন্দ করি না, সেজন্য এসব বাজে কথা পরিত্যাগ করাই ভাল।

কথা আর হল না, ছেলেটি একখানা দৈনিক পত্র নিয়ে নিজের বাসায় চলে গেল। আমিও স্থানীয় মানচিত্র নিয়ে পথের কথাই চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম।

আমার সামনে বিরাট পৃথিবী। এই পৃথিবী বাইসাইকেলে ভ্রমণ কি করে সম্পন্ন করা যায় তাই ছিল আমার চিন্তনীয় বিষয়। যখনই সুযোগ পেতাম তখনই ভাবতাম কতটুকু ভ্রমণ হয়েছে এবং আর কতটুকু বাকি আছে। অন্যান্য ভাবধারা আমার কাছে আসত অজ্ঞাতে এবং অযাচিতে।

সাইগণেয় অন্তস্থল

যে হোটেলে স্থান নিয়েছিলাম তার মালিক হলেন একজন ভিয়েতনামী। তিনি খুব কম বলেন কথা এবং কার কি অসুবিধা সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাঁর হোটেলে যাতে কোন গর্হিত কাজ না হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অন্যান্য হোটেলে প্রায়ই রাত্রে খুব গণ্ডগোল' অনুভব হয় কিন্তু এখানে তার লক্ষণ দেখতে পেলাম না। বয়রা কি চাই বলে দরজায় বার বার ধাক্কা দিত না। এক কথায় হোটেলটি ভদ্র লোকের জন্যই নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু ফরাসী রাজ্যের ভেতর বিশেষ করে ফরাসীদের কলনিয়েল দেশগুলিতে এরূপ হোটেলের খুবই অভাব।

ফরাসীরা বর্ণশংকর জাত উৎপাদনের পক্ষপাতী সে জন্যই দেহের ক্ষুধা মিটাবার জন্য নানারকমের সুযোগ এবং সুবিধা কলনিয়েল দেশ-গুলিতে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। বৃটিশ জার্মাণ, স্কেণ্ডেনেভিয়ান এবং ইউরোপের অন্যান্য কয়টি সাম্রাজ্যবাদী জাত বড়ই বর্ণাভিমানী সে জন্য বৃটিশ কলনীতে দেহের ক্ষুধা মেটাবার সেরূপ বন্দোবস্ত থাকে না। সাইগণের এই হোটেলটি দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য নয় দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম।

রাত দশটার সময় আর একটি যুবক আসল এবং জানাল, খাবার তৈরী হয়েছে এবার গেলেই হয়। আমি তার সংগে খেতে গেলাম এবং খাটি মুসলিম ধরণে একই থালাতে চারজনে মিলে খেলাম। আশ্চর্যের বিষয় কেউ কিন্তু বিস্‌মিল্লা বল্‌ল না। অনেকে হয়ত বলবেন এরূপ ভাবে একই থালাতে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু এরূপ ভাবে বসে খাওয়ার মধ্যে আন্তরিকতা আছে একথা স্বীকার করতে হবেই। গৃহস্বামী খাবারের সময় কিছুই বললেন না, খাবার হয়ে

গেলে শুধু বল্‌লেন আনন্দের সহিত সহরের সর্বত্র ভ্রমণ কর, টাকা পয়সার কোন অভাব হবে না।

পরের দিন বোরা ভদ্রলোক আমাকে একজন তামিল ভদ্রলোকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনিও ধর্মে মুসলমান। তামিল ভদ্রলোক ফরাসী ভাষায় শিক্ষিত এবং স্থানীয় পলিটিক্স সম্বন্ধে তাঁর বেশ জানাশুনা ছিল। সে জন্যই বোধ হয় তিনি বল্‌লেন "এখানে হুসিয়ার হয়ে চলবেন, ফরাসী সরকার আপনাদের মত পর্যটকদের প্রতি একটু খরদৃষ্টি রাখবেন। কাজে যাই করুন ক্ষতি নাই কিন্তু মুখে কিছুই বলবেন না। এখানকার ভিয়েতনামীরা প্রায় সকলেই বিদ্রোহী। আপনাকে পেলেই লুফে নেবে এবং তাদের প্রপেগেণ্ডার কাজে লাগাবে, অবশেষে যখন ফরাসী সরকার দেখবে আপনিও একজন বিদ্রোহী তখন তারা আপনাকে দেশ হতে তাড়িয়ে দেবে।"

আপনি আসার কয়েক মাস পূর্বে দুজন ভারতীয় পারসী পর্যটক এসেছিলেন। একজনের নাম বাবাসোলা আর অন্য জনের নাম বমগড়া। এদের ইনিসপেক্টর জেনারেলের অপিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি কাগজে বুড়ো আংগুলের টিপ দিতে বলা হয়। তারা তাতে রাজি হন নাই, সেজন্য তাদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তাঁদের এই সাহসী কাজে আমরা সুখী হয়েছিলাম এবং সেই সাহসী কাজের জন্যই এখন আর আমাদের আংগুলের টিপ দিতে হয় না। আমাদের অনেক দুঃখ দৈন্যই আছে, তার সব কি আপনারা সুধরাতে পারবেন? আমাদের মাতৃভূমি যে পর্যন্ত স্বাধীন না হয় সে পর্যন্ত আমাদের দুঃখের অন্ত নাই, অতএব আপনারা আর সেদিকে মন না দিয়ে যে কাজে এসেছেন সেই কাজ করে চলে যান।

আপনি যে হোটেলে থাকেন তাও বড় ভাল স্থান নয়। এখানেই

যত বিদ্রোহীর আড্ডা। কি ভাবে যে এরা এখানে একত্রিত হয় তা সহজে বুঝা যায় না, যখন ধরা পরে তখনই আমরা জানতে পারি কতকগুলি বিদ্রোহী আনামিত ধরা পড়েছে। এই হোটেলে আপনাকে বোরা সাহেব পাঠিয়ে অন্যায় করেছেন। এখন হোটেল পরিবর্তন করাও ভাল হবে না, আনামিতরা হয়ত হাসবে, কিন্তু খুব হুসিয়ার হয়ে চলবেন।

এতগুলি কথা শুনার পর আমারও কিছু জানবার ছিল, সেজন্য জিজ্ঞাসা করলাম, বাবাসোলা এবং বম্‌গড়ার বহিষ্কারের আদেশের সংগে কি আর কোনও সম্পর্ক ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, তাঁরা যখন এদেশে আসেন তখন তাদের মনে স্বাধীনতার প্রবল ঝড় বইছিল। কখন কাকে কি বলেছিলেন হয়ত তারও একটা প্রতিশোধ হতে পারে। রাজশক্তি তাদের দরকার অনুযায়ী কত রকমের ফাঁদ তৈরী করতে পারে তার কি শেষ আছে? যাতে যেরূপ কোন ফাঁদে পা না দিতে হয় সেজন্য ধর্ম কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই সময় বেশ কাটে, আপনিও দয়া করে মন্দির, পেগোডা এ সব দেখেই সময় কাটাবেন। যদি এসব করে সময় কাটান তবে এদেশের ফরাসী সরকার আপনার কাছেও যাবে না, আর যদি বুঝতে পারে, আপনি ভিয়েতনামীদের সংগ নিয়েছেন তবে ভ্রমণ এখানেই শেষ হবে। ভাববেন না বৃটিশ কন্‌সাল্ আপনাকে সাহায্য করবে, বৃটিশ এবং ফরাসীরা সহোদর ভাই।

তামিল ভদ্রলোকের উপদেশ পেয়ে অনেকটা উপকৃত হয়েছিলাম এবং তাঁরই নির্দেশ মতে, স্থানীয় কয়টী সংবাদপত্রে আমার আসার সংবাদ এবং সেই সংগে ভ্রমণের উদ্দেশ্যেও ব্যক্ত করেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম ধর্মের আবরণে শরীর ঢেকে রাখলে কোনরূপ বিপদ আসবার সম্ভাবনা নাই। বৃটিশ এবং ফরাসীরা এই হিসেবে এক রীতি প্রতিপালন করে চলে। বৃটিশ এবং ফরাসীরা ধর্মের মধ্য দিয়ে যত

কুকাজ করাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলাম ততই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা কমে আসছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি ১৯৩১ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে; সেই অতীত যুগে ভারতীয় মুসলিম লীগের কাজ সাইগণে কেমন ভাবে চলছিল তা স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম।

সাইগণে সপ্তাহ খানেক থাকার পর একদিন বিকালবেলা হাত কাটাবোরা যুবককে বল্‌লাম "চল ভাই, আজ তোমাকে এক স্থানে নিয়ে যাব, সেখানে বেশ মোটা রকমের অর্থ সাহায্য পাবে, কিন্তু মনে রেখো স্থানটি হল মুসলিম লীগের আড্ডা।" মুসলিম লীগের আড্ডা অনেক দেখেছিলাম। মহাত্মা গান্ধি তখন ইংলণ্ডের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। পৃথিবীর লোক তখন মহাত্মা গান্ধির কাজের দিকে খর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছিল। অনেকেই ভাবছিল মহাত্মা গান্ধি এবার জয়ী হবেন।

আমরা সন্ধ্যার পর মুসলিম লীগের আড্ডায় যাবার পর যখন শুনলাম এখানের লোক কোনও হিন্দু পর্যটকের সংগে সাক্ষাৎ করে না তখন আমি অবাক হয়েছিলাম। অবশেষে যুবকটি একজন ভদ্রলোককে অতিকষ্টে বাইরে নিয়ে এসে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি আমাকে সর্ব্বপ্রথমেই বল্‌লেন "আপনি ভিন্ন জাতের লোক, আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু, অতএব আপনার সংগে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই। বিদেশী এবং ভিন্ন জাতের লোক হিসাবে আপনাকে সামান্য কিছু সাহায্য করতে পারি।" ভদ্রলোককে দেখা মাত্রই কি একটা সন্দেহ হল, তারপর যখন ভদ্রলোকের বাণী শুন্‌লাম তখন আর বুঝতে বাকী রইল না তিনি কি পদার্থ। আমি তাঁকে হিন্দু প্রথায় নমস্কার জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলাম।

পথে এসে হাতকাটা যুবক জিজ্ঞাসা করল, "লোকের সংগে বিশেষ কোনও কথা না বলে চলে আসার কারণ কি?" যুবককে কিছু না বলে

একটি রেঁস্তোরাতে এসে কিছু খেলাম তারপর হোটেলে এসে তাকে ভাল করে বসিয়ে বললাম "তুমি যেমন ধর্মকে ঘৃণা কর আমিও তেমনি ধর্মকে ঘৃণা করি। তুমি আমাকে মুসলিমলীগ আজ দেখালে আমি কিন্তু এর পূর্বেই দেখেছি। সিংগাপুর, পেনাং, সিংকোরা প্রভৃতি স্থানে এর শাখা আছে। এদের অফিসে যাই নাই বটে কিন্তু বলতে পারব এদের অফিসে কি থাকে, তুমি এদের অফিসে নিশ্চয়ই গিয়েছ এখন বল সেখানে কি কি থাকে?" হাতকাটা মুসলিম যুবক বললে, "কতকগুলি আরবী সংবাদপত্র, হায়দরাবাদ হতে প্রকাশিত একখানা ইংলিশ দৈনিক। সুরবায়া হতে প্রকাশিত একখানা মালয় ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক, এর বেশি কিছুই নয়।" আমি বলাম, "আগে এই অফিসগুলি প্যান ইসলামীরা চালাত এখন চালায় মুসলিমলীগ।"

হাতকাটা যুবক একটু ভাবল তারপর বলল "তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে, আমি এরূপ ধরণের একটি অফিস বোম্বেতে দেখেছি তবে তারা মুসলিম লীগ বলে পরিচয় দেয় না।" আমি যুবককে আরও একটু বুঝিয়ে বললাম "আবার যখন দেশে যাবে তখন দেখবে, সেখানে মুসলিম লীগ লেখা রয়েছে। এসব অফিস পূর্বে চালাত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আর এখন যারা চালায় তাদের তুমি বেশ ভাল করেই জান।" তারপরই জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি মুসলমান হয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরোধিতা কেন কর?"

হাতকাটা যুবক একটু ভাবল তারপর বলল "গীরগাও অনচলে আমাদের দোকান ছিল। সেখানেও আমরা সিল্কই বেচাকেনা করতাম। হঠাৎ একদিন দাংগা আরম্ভ হয়। আমাদের সমাজ সকল সময়ই দাংগার পক্ষপাতী ছিল না। জানিনা কেন আমরা দাংগা পছন্দ করি না। হয়ত আমাদের পূর্বপুরুষ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই আমাদের এই প্রবৃত্তি। আমরা দাংগার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ

একটা লোক আমাকে লক্ষ্য করে একটা দা ছুড়ে মারে। লোকটা গীরগাওএর বাসিন্দা এবং আমাদের গ্রাহক। দা যাতে আমার মাথায় না লাগে সেজন্য বাঁহাতটা দিয়ে দাঁটা আটকাইবার চেষ্টা করি। দা আটকিয়ে ছিলাম কিন্তু হাত কেটে যায়। হাতকাটা অবস্থায় হসপিটলে যাই এবং মাসেক পরে সামান্য আরোগ্য হয়েই বাড়িতে এসে "এন্‌টি রিলিজিয়ন সোসাইটি" গঠন করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে প্রকারের ধর্মই হউক না কেন, বর্তমানে ভারতে ধর্মমাত্রই সমভাবে কাল সাপের মত বিষ উদ্গারণ করছে অতএব এই কাল সাপগুলির দমনার্থে এন্‌টি রিলিজিয়ন সোসাইটি গঠন করেছিলাম। কিন্তু পেরে উঠি নাই। নিজের সমাজের লোকই আমার বিরোধীতা করতে থাকে। আমি কিন্তু আমার চিন্তাধারা পরিত্যাগ করি নাই। এদেশে এসেও সেরূপ কাজে নিযুক্ত আছি। আচ্ছা কাল তোমাকে একটি হিন্দু মন্দিরে নিয়ে যাব। সেখানে দেখবে কত বুজুরকী চলে।" আমাদের কথার শেষ এখানেই হয় নাই, আমরা যখনই সুযোগ এবং সুবিধা পেতাম তখনই এই ধরণের চিন্তা করতাম।

কয়েকটি সংবাদ পত্রে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য সমেত কি কি দেশ ভ্রমণ করে এসেছি তার ফিরিস্তি যখন বের হয়ে গেল তখন দু'রকমের লোক আমার সংস্পর্শে আসতে আরম্ভ করল। প্রথম দলের লোক চাইল, আমি যাতে পথ ভ্রষ্ট হই, ভ্রমণ যাতে এখানেই শেষ হয়। দ্বিতীয় দলের লোক কুপথ আর কুকথা বহন করে। উভয় দলের সংগেই সমান ভাবে মিশতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এটা ঠিক করে নিলাম, কোন মতেই আমি পথভ্রষ্ট হব না।

পরের দিন হিন্দু মন্দিরে গিয়েছিলাম। মাদ্রাজীরা তাদের মতে মন্দির গঠন করেছে। তাদের মন্দির গঠনের ধাচ্ একই ধরণের। মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র মনে হয় মাদ্রাজের কোথাও ভ্রমণ করছি।

মন্দিরের সামনে একটি নাট্য মন্দির। এ দেশে দেবদাসী রাখার প্রথা নাই, কিন্তু নাট্য মন্দির ছাড়া দেব মন্দির হয় না। নাট্য মন্দিরে সকলেই যেতে পারে। আমরাও গেলাম। নাট্য মন্দিরের চারিপাশে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টেদের ছবি অতি যত্নে রক্ষিত হয়েছে। তাতে সৌকত আলীর ছবিও ছিল। হাতকাটা যুবক সৌকত আলীর ছবি দেখিয়ে বল্ল "হিন্দুদের মধ্যে ধর্মভাব আর রাষ্ট্রনীতি আজকাল একই বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। মুসলমানদের অধঃপাতের একমাত্র কারণ হল, ধর্ম এবং রাষ্ট্রনীতি একই ছাচে ফেলে দিয়ে দুটাকে একত্রিত করে ফেলা।" বাস্তবিক বিষয়টা চিন্তা করলে মনের মধ্যে একটা আলোড়ন আসে বৈ কি? আমি কিন্তু এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করলাম না। মন্দিরটি শুধু বেশ ভাল করে দেখতেছিলাম।

আমরা সন্ধ্যার একটু পূর্বে মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা হওয়া মাত্র দলে দলে লোক মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করল। নানাজন নানামতে দেবতাকে "প্রণাম" জানাতে লাগল। কেউ দু হাত উপরে তুলে দাঁড়াল, কেহ কানে কানমলা খেতে লাগল, কেহ নিজের গালে নিজেই চপটাঘাত করতে লাগল, কেহ বা জিহ্বায় কামড় দিতে কেহ বা একপায়ে দাঁড়িয়ে রইল আর কেহ বা নাট মন্দিরের মেঝেতে প্রণত হয়ে রইল। এরূপ ভাবে যখন লোক নিজের অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছিল তখন মন্দিরের ভেতরের দরজা খুলে গেল। বিজলী বাতির আলো স্বর্ণালংকার ভূষিত বিগ্রহের উপর পড়ে চমৎকার দেখাতে লাগল। আমি যখন তন্ময় হয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলাম তখন হাতকাটা যুবক জিজ্ঞাসা করছিল—

কি দেখছ?

সৌন্দর্য্য।

এর বেশী কিছু নয়?

এর বেশী কিছু দেখছি বলে মনে হচ্ছে না।

হাতকাটা যুবক বলল "এর বেশী কিছু দেখার নাই, চল এখান থেকে যাই, যেরূপ ভাবে শঙ্খ ঘণ্টা বাজছে এর মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলা যেতে পারে না।" আমরা বের হয়ে আসা মাত্র যুবক বলল "চীনারা এই দৃশ্যটিকে প্রসংশা করে ভক্তি করে না। ভক্তি দৌর্বল্যতার লক্ষন। তোমার মনেও ভক্তি রয়েছে, তা আমি অনুভব করেছি। বাস্তবে আসতে হবে নতুবা কিছুই বুঝতে পারবে না।" আমি যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব চিন্তা তুমি কোথা হতে পেলে? যুবক জানাল সে অনেক ফরাসী বই পড়েছে এবং সেই বইগুলিতে এসব চিন্তাধারার বেশ সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। যুবক দুঃখ করে বলল "যদি আপনী ফরাসী ভাষা জানতেন তবে কয়েকখানা ফরাসী বই উপহার দিয়ে সুখী হতাম।"

সাইগণে একুশ দিন ছিলাম। প্রত্যেকটি দিনই আমি নূতন কিছু দেখতাম এবং রাত্রে যতটুকু সম্ভব তাই নোট বই এ লিখে রাখতাম। যখন আমি ডাইরি লেখতাম তখন খুব চিন্তা করতে হত। এমন কিছু লিখতাম না যাতে সমাজের অনিষ্ট করতে পারে। সেদিন ন'টার পূর্বেই ডাইরী লিখতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে একটি লোক এসে দোকানে যেতে সংবাদ দিল। ডাইরী বন্ধ করে দোকানে গেলাম। গিয়ে দেখি বৃদ্ধ বোরা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। যাওয়া মাত্রই তিনি বললেন "তোমার সঙ্গে একজন ফ্রেন্চম্যান দেখা করতে চায়, সে তোমার হোটেলে রাত বারটার সময় যাবে, হয়ত তোমাকে নিয়ে গাড়ীতে রাতে বেড়াতেও বের হবে, তুমি তাকে মোটেই ভয় করবে না। সে একজন প্রসিদ্ধ লোক। তোমার কোনও অনিষ্ট করবে না।" বৃদ্ধের কথা এখানেই শেষ হল তারপর খেতে গেলাম। খাওয়া শেষ করে হাতকাটাকে জিজ্ঞাসা করলাম "বিষয় কি হে?"

আমি তাকে জানি সেও একজন পর্য্যটক।

আর কিছু নয়ত ?

আরও কিছু।

তা কি ?

কমিউনিষ্ট।

সাইগণের মত স্থানে কমিউনিষ্টের সংগে বন্ধুত্ব করা বড়ই খারাপ হবে তা আমি জানতাম সেজন্য একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমাকে চিন্তিত দেখে হাতকাটা বল্‌ল "চিন্তা করো না, সে কমিউনিষ্ট বলে সকলের কাছে পরিচিত নয়, যারা বুঝে তারাই তাকে চিনতে পারে। তোমার কাছে সে যাবে এস্‌পেরেণ্ডো ভাষা প্রচারের জন্য। সে ইংলিশ বেশ জানে কিন্তু ভান্‌ করবে একটি ইংলিশ শব্দও জানে না। তার সংগে সকল সময়ই একখানা এসপেরেণ্ড ইংলিশ ডিক্‌সনারী থাকে। তাই দেখে সে কথা বলে। লক্ষ্য করে দেখো, সে যখন ইংলিশ শব্দ খুঁজে তখন তার দৃষ্টি ডিক্‌সনারীতে থাকে না, তার দৃষ্টি থাকে যার সংগে কথা বলে তার মুখের দিকে। এখন যাও, দরজা খুলে রেখ, বড়ই দুঃখ আমি যেতে পারব না।"

হোটেলে এসে কাপড় বদলী না করেই ডায়রী লেখলাম, তারপর বিছানায় শুয়ে থাকলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম তার ঠিক ছিল না। হঠাৎ মনে হল কে আমার মাথায় হাত দিয়েছে এবং পা দিয়ে মেজেতে শব্দ করছে। উঠে দেখি ফ্রেন্‌চম্যান সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। এরূপ হাসতে কোনও ফ্রেন্‌চম্যানকে এদেশে দেখেছি বলে মনে হয় না। লোকটির হাসি দেখেই মনে হয় তাতে বেশ সরলতা আছে। কাছের চেয়ারটি দেখিয়ে বল্‌লাম "বসুন"। সে বসল এবং আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল "মশিয়ে এস্‌পেরেন্ত জানেন ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "সে আবার কি ভাষা ? এত নূতন ভাষার নাম জেনে আমার কোন দরকার নাই। ইংলিশ ও

জানি না, এমনকি নিজের ভাষা পর্যন্ত জানি না এর উপর আবার এস্‌পেরেন্ত, এসব কথা জেনে দরকার নাই, এখন বলুন কিসের জন্য এসেছেন ?"

প্যা'রেয়ারী আরও হেসে বল্‌লেন "রাগ করে লাভ নাই, আমি জানতে এসেছি আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি ? আমি কিন্তু অনেক দেশ বেড়িয়ে এসেছি।"

কোন কোন দেশ বেড়িয়ে এসেছেন ?

জার্মাণী, পোলেণ্ড, সোভিয়েট, রুশিয়া, চীন, কোরিয়া জাপান, তারপরই এই দেশ। বর্তমানে আমি চক্ষুরোগে কষ্ট পাচ্ছি, একটু আরাম হলেই ভারতের দিকে রওয়ানা হব। এখন বলুন আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি ?

আমার একই কথা। সিংগাপুর হতে রওয়ানা হবার পর সংবাদ পত্রের রিপোর্টারদের যা বলেছিলাম, মশিয়ে প্যারেয়ারীকে তাই বললাম।

প্যারেয়ারী অনেকক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন "এসব হল খত্‌ বাঁধা কথা। আমি ত আপনার পর নই, আমার কাছে মনের কথা বলতে কি ?"

লোকটির কথা শুনে রাগ হয় নাই ভয় হয়েছিল। মনে হচ্ছিল প্যারেয়ারী একজন গোপনীয় পুলিশ। গোপনীয় পুলিশ অনেক সময় যে যা করে না, তার প্রতি অত্যাচার করে তাই বলায়। সেজন্য রাগ করে বল্‌লাম, আমি যা বলেছি তার বেশি আমার আর কিছু বলার নাই। তারপরেও যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন তবে মনে করব আপনি একজন পুলিশম্যান এবং জোর করে আমার মুখ থেকে আমি যা নই তাই বল্‌তে চান।

এবার প্যারেয়ারীর চৈতন্য হল। সুর বদলিয়ে বল্‌লেন "চলুন একটু

বাইরে যাই, আমার বেশ ক্ষুধা হয়েছে, রেঁস্তোরায় গিয়ে কিছু খাওয়া যাবে। মনে রাখবেন আমার কাছে একটি পয়সাও নাই।"

প্যারেয়ারীকে বিদায় করে দেবার জন্যই নিকটস্থ রেঁস্তোরায় গিয়ে বসলাম। রেঁস্তোরা আনামীতরা চালায় এবং সেটা তাদের জন্যই। দাম সকল জিনিষেরই ফরাসী হোটেলের চতুর্থাংশ। প্যারেয়ারী দুটা ডিম, একটা রুটি এবং এক মগ কাফি খেয়ে বললেন "এবার পয়সা দিয়ে উঠুন আমরা একটু দূরে প্যায়চারী করতে যাব।" পাইচারী করা আমার অভ্যাস ছিল না। যারা বাইসাইকেলে ভ্রমণ করে তাদের দ্বারা শহরে পথে হাটা মোটেই সম্ভব হয় না। তবুও প্যারেয়ারীর সংগে চলতে হল। তিনি একজন ইউরোপীয়ান পর্যটক এবং অনেকগুলি দেশ বেড়িয়ে এসেছেন আশা ছিল হয়ত তার কাছ থেকে নূতন অনেক কিছুই জানতে পারব।

তখন অনেক রাত হয়েছে। আমরা একটি গলি পথ ধরে যেতে-ছিলাম। গলিটা প্রায় অন্ধকার। গলিটা শেষ হবার পরই একটু দূরে অনেকগুলি বিজলীবাতি প্রজ্জ্বলিত একটি স্থান দেখে মনে হল, হয়ত সিনেমা ঘর হবে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম এটা সিনেমা ঘর নয়, বারবণিতালয়। অনেকগুলি যুবতী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। যুবতীদের চখে রংগিন চশমা।

প্যারেয়ারী আমাকে জিজ্ঞাসা করল—এদের দেখতে কেমন লাগে?

বেশ সুন্দর।

এদের চখে চশমা কেন বলতে পারেন?

না।

চলুন কাছে যাই, বলেই প্যারেয়ারী আমার হাত ধরে যুবতীদের কাছে গেলেন এবং যুবতীর আদেশ না দিয়ে একজনের চখের চশমা খুলে ফেলল, দেখলাম যুবতী অন্ধ। দ্বিতীয় যুবতীর চশমা খুলে নেওয়ার

পর দেখলাম সেও অন্ধ। তারপর আমি একটি যুবতীর চশমা খুলে নিলাম, দেখলাম সেই যুবতীও অন্ধ। আর আমরা চশমা খুললাম না। চশমা ফেরত দেবার সময় প্রত্যেককে আধা পেসো (বারো আনা) করে দিয়ে স্থান ত্যাগ করলাম।

ফেরার পথে প্যারেয়ারী জিজ্ঞাসা করলেন, এদের দেখে আপনার কি মনে হল ?

ঈশ্বরের ইচ্ছা আর এদের দুর্ভাগ্য এর বেশি আমি আর কি বলব মশাই ?

প্যারেয়ারী বল্লেন, এরূপই যে বলবেন আমি তা বুঝতে পেরে-ছিলাম। এখন তাড়াতাড়ি করে পথ চলুন। আমাদের দুই মাইল পথ চলতে হবে।

তাড়াতাড়ি করে পথ চলে শহরের একটি ফরাসী রেঁস্তোরায় বসে আবার কিছু খেয়ে উভয়ে হোটেলে ফেরলাম। হোটেলে আসার পর প্যারেয়ারী বল্তে আরম্ভ করলেন "যে সকল যুবতীদের আমরা দেখে এলাম তারা সকলেই একেবারে পাড়াগায়ের লোক। ফরাসী সেপাইরা এখন পাড়াগাঁয়েও যেতে আরম্ভ করছে। শান্তি স্থাপনের উছিলা করে তারা নারী ধর্ষণ করে। এই নারীরা দুষ্ট রোগ সম্বন্ধে কিছু জানে না। দুষ্ট রোগ যখন তাদের আক্রমণ করে তখন ক্ষত স্থানের নানারূপ দুষিত ক্লেদ তাদের চখে লাগে এবং সে জন্যই তারা অন্ধ হয়। অন্ধ হবার পর তাদের মা বাবা অন্ধ বালিকার প্রতিপালন করতে কষ্ট অনুভব করে। শহরে দালালগণ এই অন্ধ বালিকাদের শহরে নিয়ে এসে চশমা পড়িয়ে গণিকাবৃত্তিতে পুনরায় নিযুক্ত করে। পুনরায় নিযুক্ত অবস্থায়ই আপনি এদের দেখে এলেন। এদের ভাগ্য ভালই ছিল, কিন্তু ফরাসী সেপাইদের বর্ব্বরতার জন্য এদের এই দুর্দশা হয়েছে। কোনও পরাধীন দেশে যখন স্বাধীনতার প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠে তখন শাসকশ্রেণী পরাধীনকে

পরাধীন করে রাখবার জন্য নানারূপ অত্যাচার করে। অন্ধ বালিকারা হল পরাধীন ভিয়েতনামীদের প্রথম বলিদান। আপনাদের দেশেও অনেক যুবক যুবতী নিশ্চয়ই অত্যাচারীত হচ্ছে, সেই সংবাদ আপনি রাখেন না, সেজন্যই সকল অবজ্ঞার বোঝা ভাগ্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পথের মাইল পোষ্টগুলি গুনেই সুখী হচ্ছেন। ভাগ্য এবং ঈশ্বর বলে যে দুটি কল্পনা প্রসূত চীজ্ তা পরিত্যাস করে যদি ইন্দোচীন ভ্রমণ করেন তবে ভাল হবে।"

কথা বলে সময় কাটছিল বেশ কিন্তু দেওয়ালের ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে চারটা বাজা মাত্র প্যারেয়ারী উঠলেন এবং বল্লেন "আজ বিদায় নিচ্ছি, আপনাকে আরও কিছু দেখাতে হবে। আপনাকে আমি খাটি পর্যটক করে ছাড়ব তবে আমার ভ্রমণের সার্থক হবে।"

প্যারেয়ারী চলে যাবার পর পূর্ব অভ্যাস মত বেশ করে পুনরায় প্রার্থনা করলাম এবং শুয়ে থাকলাম। কিন্তু চোখ বুজবার পুর্বেই একটি বয় এসে এক খানা পত্র আমার হাতে দিল। পত্রের জবাবের জন্য সে দাঁড়িয়ে ছিল। পত্র পাঠ করে বুঝলাম এটা স্থানীয় যুব সংঘ হতে এসেছে। পত্র ফেরৎ না দিয়ে তৎক্ষণাৎ দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে তা পুড়িয়ে ফেল্লাম এবং বয়কে বল্লাম পরশু রাত্রে দেখা করতে বল। আমি ভাবছিলাম প্রৌঢ় লোকটি আমার কথা বুঝবে না। কিন্তু সে যখন "ঐ মশিয়ে" বলেই কোন সময় ওরা দেখা করতে আসবে জিজ্ঞাসা করল তখন আমি আর হাসি রাখতে পারলাম না। বল্লাম "ভাবছিলাম আপনি মাত্র একজন বয়, কিন্তু এখন দেখছি আরও কিছু। আগামী পরশু সময় বুঝে ওদের নিয়ে আসবেন। শুধু সময় বুঝে নয়, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। আমি কিন্তু এ দেশ হতে বহিষ্কার হতে চাই না, একথাটাও মনে রাখবেন।" বয় পুনরায় বল্ল "ঐ মশিয়ে" এবং সুপ্রভাত জানিয়ে বিদায় নিল।

জীবন কর্মময়

ভাবছিলাম সাইগণে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম করি। তা কিন্তু হয়ে উঠল না। প্রথম পাঁচদিন গিয়েছিল দেখাশুনা করতে, তারপরই এসে জুটলেন "মশিয়ে প্যারেয়ারী"। এখন আবার নূতন আর এক উপসর্গ হয়েছে। তিনি হলেন স্থানীয় দ্বভাষী। নাম মহাম্মদ। দেশ কোথায় সঠিক বলা কঠিন। হিন্দুস্থানী, মালয়, ইংলিশ এবং ফরাসী ভাষায় দ্বভাষী কাজ করেন। সাতটা বাজবার পূর্বেই একটি বোরা ছেলেকে নিয়ে তিনি আমার দরজায় ধাক্কা দিলেন? তখন আমি অঘোর ঘুমে। বার বার ধাক্কা দেবার পর উঠতে হল। যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, দরজা খোলা মাত্র সে সকলের আগে রুমে প্রবেশ করে জল ঠিক আছে জানান। আমিও ওদের বসিয়ে নীচে হাত মুখ ধুইতে গেলাম। বয়ও সংগে চল্ল। বাথরুমে প্রবেশ করা মাত্র সে আমাকে একখানা কাগজ দেখাল। তাতে লেখা ছিল, নবাগত লোকটি যদিও দ্বভাষী বলেই পরিচয় দেবে, আসলে কিন্তু সে গোপনীয় পুলিশ। রাত্রে কোথায় গিয়েছিলেন সে কথা ওকে বলবেন না। কাগজ খানা দেখার পরই বয় কাগজখানা দিয়ে চলে গেল। আমিও ভাল করে স্নান করে প্রায় আধ ঘণ্টা পর আসলাম এবং পার্টি বের করে হেসে মিস্টার মহাম্মদকে বল্লাম "স্নান করে আসতে হল বলে কিছুই মনে করবেন না। চলুন রেঁস্তোরায় যাই, জানেনইত আমি গরিব লোক, আজ আপনার সাহায্য নিয়েই সকালের খানাপিনাটা শেষ করা যাক।"

মহাম্মদের চোখ চরখ গাছ হল। তিনি বল্লেন "খানা তারপর পিনা এ কেমন কথা? আপনি তবে মদ্যপায়ী?"

আরে যত ভবঘুরে দেখবেন তাদের কোনটার চরিত্র দোষ নাই বলুন ত?

মহাম্মদ এবার আরও চম্‌কিলেন কারণ এত খোলাভাবে কে নিজের

দোষ স্বীকার করে। আমাকে পরিত্যাগ করার জন্যই বোরা ছেলে আলীকে বল্‌লেন "বাবুকে তোমাদের ওখানে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে আন আমি না হয় বিকালে এসে দেখা করব।" আলী বললে "তাই হবে মশিয়ে, এখন আপনি যেতে পারেন।" মিঃ মহম্মদ আমাকে "আদাব আরজ" বলে বিদায় নিলেন আমি কিন্তু 'সেলাম আলীকুম' বলেছিলাম।

মহম্মদ চলে যাবার পরই আলী বল্‌লে "ভাই সাহেব বলে দিয়েছেন তুমি এর সংগে দিল খুলে কথা বলবে না, সে তোমার সর্বনাশও করতে পারে ভালও করতে পারে, যাক্ তুমি আজ আমাদের যেমন বাঁচিয়েছ, তোমাকেও বাঁচিয়েছ। পারেয়ারীর কথা এর কাছে কোন মতেই বলবে না।" আলীকে বল্‌লাম "সে হিসেবে আমাকে তোমরা সঠিকভাবে নির্ভর করতে পার, চল যাই কিছু খেয়ে শুইতে হবে।" গতরাত্রে চারটার সময় শুয়েছিলাম। স্নান করে কিছুটা আরাম পেয়েছি। বিকালের দিকে আমাকেই মহম্মদের বাড়িতে যেতে হবে, দেখতে হবে তিনি কত বড় গোয়েন্দা?

রেঁস্তোরায় কিছু খেয়ে, হোটেলে এসে দুঘণ্টার মত ঘুমিয়ে নিলাম, তারপর একটি সংবাদ পত্র অফিসে গিয়ে সংবাদ পত্রের সম্পাদকের সংগে দেখা করলাম। সম্পাদক বেশ ভদ্রভাবে আমাকে গ্রহণ করে ইংগিতে জানালেন তিনি কথাও বলতে পারেন না কানেও শুনেন না। আমার যদি কিছু বলবার থাকে তবে লিখে দিতে পারি। আমার বক্তব্য যখন লিখতে ছিলাম তখন একটি ভিয়েতনামী বয় সম্পাদককে কি বল্‌ল। তিনি ঘার ফিরিয়ে হাত নেড়ে বয়কে চলে যেতে বল্‌লেন। তাঁর ঘার ফিরিয়ে চাওয়া দেখতে পেয়েছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম সম্পাদকটি একের নম্বর ধুরন্ধর। আমার কাজ শেষ করে যখন পথে বের হলাম তখন পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সম্পাদকের সংগে দেখা

হল। তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। দেখা হওয়ামাত্র তিনি বল্‌লেন 'স্যার বিশ্বাস, আপনার নাকি ম্যনিবেগ চুরি হয়েছে?" এতবড় একজন সম্পাদকের কাছ থেকে হঠাৎ এরূপ কথা আমি প্রত্যাশা করিনি। বিষয়টি একেবারে অস্বিকার করলাম। কিন্তু তিনি নাছোরবান্দা। তিনি বল্‌লেন "স্যর বিশ্বাস, আমার পত্রিকাতে ঘটনাটা বের হবেই আপনি না করলে কি হবে?" যারা একবার মিথ্যাকথার আশ্রয় নিয়ে কিছুটা সুফল পায় তারা মিথ্যার ব্যবহার করতে ছাড়ে না। আমাদের দেশে তার হাজার হাজার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোক প্রায়ই ভাড়াটে হয় এবং ভবিষ্যতে তাদের কাজের কি ফল হবে সে বিষয়ে মোটেই চিন্তা করে না। ফরাসীদের মধ্যে এরূপ লোক থাকা সমুহ অন্যায় কারণ ফরাসীরা নিজেদের সভ্যবলে পরিচয় দেয়।

যে তামিল ভদ্রলোক আমাকে সংবাদপত্র অফিসগুলিতে নিয়ে যেতেন, বিষয়টি তারই সাজানো ছিল। তিনিও সম্পাদকের একই সংগে ছিলেন। এর মানেই হল আমাকে উপলক্ষ করে ভিয়েতনামীদের বদ্‌নাম দেশে এবং বিদেশে প্রচার করা। তামিল ভদ্রলোকের স্বরূপ বুঝতে পেরে এর পর থেকে তাঁর সংগে কথা বলতাম না এবং বোরা ভদ্রলোককে জানিয়ে দিয়েছিলাম এরূপ লোকের সংগে যেন আর কোথাও নবাগতকে পরিচয় করিয়ে না দেন। ভারতবর্ষের লোক যদি এরূপ না হ'ত তবে আমাদের এত দুর্দশা হবার কারণ ছিল না। ভারতবাসীর একমাত্র আদর্শ হল টাকা এবং টাকাকে পাহারা দিয়ে রাখবার একমাত্র অস্ত্র হল ধর্ম যা সামাজিক রীতিতেই আবদ্ধ।

পর পর দুটা দুর্ঘটনা ঘটার পর হোটেলে ফিরে এসে বয়কে সকল কথা জানালাম। বয় বললেন "কুছ পরওয়া নেই, আমি এ সব হতে আপনাকে রক্ষা করব।" বয় একখানা কাগজে সম্পাদকের নামে

একখানা চিঠি লিখতে বললেন। বয়ের কথা অনুযায়ী সম্পাদকের কাছে পত্রখানা লিখে বয়ের মারফতেই সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সুখের বিষয় এই সাজানো দুর্ঘটনা আর পত্রিকাতে প্রকাশ হয় নাই।

আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণ বয়ের অনুবাদ করতে গিয়ে ছোকরা লিখতে বেশ আনন্দ পান কিন্তু এই হোটেল বয়টি আমার মনে হয় আমাদের দেশের অনেক আনাচে কানাচে গলির সাহিত্যিকদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ এক সুলেখক কারণ তাঁরই লেখা অনেক প্রবন্ধ অনেক গোপনীয় সাপ্তাহিকে প্রকাশ পেত। আমাদের দেশে অনাথ গোপাল সেন মহাশয়ই সর্বপ্রথম "টাকার কথা" নামে একখানা বই লেখেন কিন্তু ১৯৩১ সালে এই বয়ই Money বলে একটা চারপৃষ্ঠাব্যায়ী প্রবন্ধ এক ভিয়েতনামী জার্নেলে লিখেছিলেন এবং তার টাইপ কপি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। তখন "ম্যানি" কথাটার তাৎপর্য বুঝতাম না কিন্তু যেদিন অনাথ গোপাল সেনের 'টাকার কথা' পড়লাম সেদিন বুঝলাম টাকা কাকে বলে আর সংগে সংগে বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের দেশের সাহিত্যিক কেন "বয়ের" বাংলা "ছোকড়া" বলে লিখেন।

সন্ধ্যা হবার পূর্বেই বেশ ঘটা করে বৃষ্টি নামল। হোটেলের বারান্দায় বসে যখন আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছিলাম তখন বয় এক পেয়ালা কাফি আমার হাতে দিয়ে বললেন "দুজন ভিয়েতনামী আপনার সংগে দেখা করতে চায়।" এখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে কেউ আসবে না, আপনারা আরামে কথা বলতে পারবেন। যদি কেউ আসে তবে আমি বেল বাজিয়ে দেব, ভিয়েতনামীরা অন্য রুমে চলে যাবে।

ঘরে গিয়ে দেখি দুজন যুবক বসে আছেন আমার অপেক্ষায়। তারা ইন্দোচীনের বাসিন্দা নন, ইন্দোচীনের কাছেই কতকগুলি দ্বীপ আছে

সেখান থেকে এসেছেন। সেখানে কয়লার খনি আছে। তারা কয়লার খনিতে কাজ করেন এবং মজুরদের মধ্যে, শিক্ষা এবং একতা আনবার চেষ্টায় আছেন। তাদের দলের অনেক কর্মীদের ফরাসী সরকার সাবাড় করেছে এবং তাদের ধরতে পারে তবে তাদেরও সাবাড় করবে। ইত্যাকার পরিচয় দিয়ে তারা ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের সম্বন্ধে কতকগুলি লিখিত প্রশ্ন আমার কাছে হাজির করলেন। আমি কোনদিন অসহযোগ আন্দোলন দেখি নাই কারণ ১৯১৯ সাল হতেই ভারতের বাইরে ছিলাম। ১৯২৪ সালে যখন দেশে ফিরে আসি তখন কোথাও সেরূপ আন্দোলনকারীদের সংস্পর্শে আসি নাই। এদের প্রশ্ন নিয়ে মহা বিপদে পড়লাম অবশেষে সাপ্তাহিক বসুমতী, ইয়ং ইণ্ডিয়া এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে যা পড়েছিলাম তারই কথা সবিস্তারে তাদের কাছে বললাম। মহাত্মা গান্ধির নিউ ইণ্ডিয়ারও গ্রাহক ছিলাম। বড়দলী সত্যাগ্রহের কথা তাতে পড়েছিলাম তাও বলেছিলাম। প্রশ্নকারীরা যখন শুনলেন বৃটিশ কাউকে সাবাড় করে না শুধু অত্যাচার করে তখন তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাদের আলোচনা করতে না দিয়ে আমি বললাম, যেখানে যতদূর করলে কার্য ফতে হয় বৃটিশ তাই করে। দরকার হলে গুলিও চালায়। আপনারা হয়ত ফরাসীদের স্বার্থে প্রবল আঘাত করেছেন সেজন্য ফরাসীরা আপনাদের গিলটিনে দিচ্ছে, এর বেশি আর কি হতে পারে। একজন বললেন, "Exectly that" যার বাংলা আমি করব "অবিকল তাই।" কর্মিরা বেশিক্ষণ বসলেন না। আমিও বয়ের সাহায্যে খাদ্য আনিয়ে সেদিনের মত দরজা বন্ধ করে দিলাম।

দশটা বাজতেই দুভাসী মহাশয় এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন "ইন্দোচীনের পুলিশের বড়কর্তা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আজই দুটার সময় দুভাসীর সঙ্গে যেতে হবে।" তাই হবে জানিয়ে হোটেল হতে

বের হয়ে হাতকাটার সংগে দেখা করলাম। হাতকাটা যখন শুনল পুলিশের বড়কর্ত্তা আমাকে ডেকেছেন তখন সে আনন্দিত হয়ে বললে "সংবাদপত্রে তুমি যে সকল কথা বলেছ এর বেশি কিছুই বলো না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলার চেষ্টা করবে।"

বারটার পূর্বেই খেয়ে শুয়ে থাকলাম। একটু ঘুম হয়েছিল। তারপরই দুভাসী মহাশয় সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন "আমার কি কোট প্যাণ্ট নাই?" আমি বললাম, "এসব বালাই আমি রাখি না, যা দরকার তাই রাখি।" আমার পোষাক পরেই আমি পথে বের হলাম। পথে আসবার পর দুভাসী মহাশয় আমাকে বললেন, "যেন ভদ্রভাবে কথা বলি। প্রশ্নের উত্তর যেন ঠিক ঠিক ভাবে দেই।" দুভাসীর কথা শুনে আমার দুঃখ হল। আমি জানতাম যারা অপরিণামদর্শী তারাই অহমিকা দেখায়। দুভাসীকে কথা দিলাম আমার মুখ হতে একটিও অহংকারসূচক বাক্য বের হবে না। প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক ভাবেই দেব।

ইন্দোচীনের পুলিশের বড় কর্তার অপিস লালবাজারের মত বড় ছিল না। দোতলা একটা বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে নানারূপ নয়নাভিরাম বৃক্ষে শোভিত। দরজায় পাহারাদার নেই। ঘরের সামনে মাত্র দুজন সিভিলিয়ান পুলিশ। প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক বন্দুক। ইচ্ছা করলেই দুইশত লোককে যে কোন সময় হত্যা করতে পারে। অফিসের ভেতর দৌড়াদৌড়ি চাঞ্চল্য এসব কিছুই নেই। ঠিক দুটার সময় আমরা বড়কর্তার ঘরে প্রবেশ করলাম। বড়কর্তা করমর্দ্দন করে বসতে দিলেন। আমি সিগারেট খাই সে কথা বোধ হয় জানতেন সেজন্য সিগারেট দিলেন এবং ইংরেজীতেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেন। বড়কর্তা সর্বপ্রথমই আমাকে ইন্দোচীনে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

আংকোর ওয়াট দেখাই ইন্দোচীনে আসার সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য ছিল এই কথাটাই আমি তাঁকে বললাম এবং আংকোর ওয়াট বৌদ্ধযুগের আগে না বৌদ্ধযুগের পরে তৈরী হয়েছিল তাও জানার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমি যখন জানালাম, স্থানীয় পুলিশ আমার এই গবেষণায় বিশেষ বাধা জন্মিয়েছিল তখন দেখলাম পুলিশের বড়কর্তার মুখের রংএর পরিবর্তন হয়েছে। তিনি দুঃখ করে বললেন, কম্বোজের লোকগুলি মানুষ চিনতে ভুল করে। তারপর আংকোর ওয়াট সম্বন্ধেই কথা হতে লাগল। আমি বলতেছিলাম মন্দিরের কাজ বৌদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল এবং তান্ত্রিক যুগে তাহা সমাপ্ত হয়েছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্বে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হবার কয়েকটি নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, যেমন আম্রপল্লব সমন্বিত কলসী। তারই পাশে নানারকম উদ্ভিদের চিত্র। এসব হল অস্টিক সভ্যতার লক্ষণ। অস্টিক সভ্যতার সময়েও হরপার্বতীর প্রাধান্য ছিল। আদিম যুগে পৃথিবীর সর্বত্র যেমন করে লিংগ পুজার ব্যবস্থা ছিল। তারপরের যুগেই ঠিক সেরূপ স্ত্রীপুরুষের একত্রে শ্রদ্ধা দেখানোর নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয় পূর্বের শিব লিংগ অপসরণ করে সেই স্থানে বৌদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল এবং তান্ত্রিক যুগে পুনরায় বৌদ্ধদেবের আশে পাশে নানারূপ মূর্তির সমাবেশ হয়েছিল। এসব মূর্তির মধ্যে গণেশ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

আমার কাল্পনিক কথা শুনে পুলিশের বড়কর্তার পুলিশি মেজাজ চলে গেল। কাফি আনার আদেশ হল, আমরা আরও সরলভাবে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলাম, দুভাসী মহাশয় আমাদের কথার ফোয়ারা দেখে গোপনে অন্তর্দ্ধান করেছিলেন কারণ এতবড় অফিসারের সামনে তার বসবার অধিকার ছিল না।

আংকোর ওয়াটের কথা শেষ করেই ভিয়েতনামী এবং কম্বোজদের

কথা উঠল। এখানেও ঐতিহাসিক তথ্য নিয়েই কথা হতে লাগল। ভিয়েতনামী এবং কম্বোজদের মধ্যে আদায় কাচকলায় সম্বন্ধ নিয়ে কথা উঠল। আমার মন্তব্য জানবার জন্যই পুলিশ সাহেব আগ্রহান্বিত হলেন। আমি তাঁকে আমার মন্তব্য এ বিষয়ে অতি অল্পই বলতে পেরেছিলাম। বলছিলাম, "মালয় দেশে, শ্যামে এবং ইন্দোচীনে যে সকল চীনা আছে তাদের আচার ব্যবহার যদি তাদের দেশের লোকের আচার ব্যবহারের মতই হয় তবে আমি বলব, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছিল একটি রণক্ষেত্র কারণ অস্টিক জাত এবং চীনাদের মধ্যে এখানে ক্রমাগত লড়াই হয়েছিল এবং সেজন্যই বোধহয় এখনও মেকং নদীর উভয় তীরে উভয় জাতের কিল্লা দেখতে পাওয়া যায়। মেকং নদীর পশ্চিম তীরে ভিয়েতনামীরা বার বার হামলা করেছে এবং কম্বোজরাও তার প্রতিরোধ করেছে। যখন বৌদ্ধধর্ম এই দেশগুলিতে লোকের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল তখনই এদের বিবাদের উপশম হয়। কেন যে উভয় জাতের মধ্যে লড়াই হতো সে কথা আমি বলতে পারব না। কোচিন চীনা এবং আনামদের অনেক বৌদ্ধমন্দির দেখেছি। আনামদের বৌদ্ধমন্দিরে শুধু বুদ্ধদেবের মূর্তিই দেখতে পাওয়া যায়, কম্বোজ দেশে কিন্তু তা নয়। বুদ্ধদেবের মূর্তির পাশেই আরও নানারকমের বর্বর যুগের মূর্তিরও সমাবেশ রয়েছে। যদিও পালী ভাষা ভিয়েতনামীরা আগ্রহের সহিত শিক্ষা করে, তবুও দেখতে পাওয়া যায় এদের মধ্যে কম্বোজদের মত পালী ভাষার প্রতি তত আগ্রহ নাই। কনফিউসস ধর্মের প্রভাবই বোধ হয় তার একমাত্র কারণ।

আমার কথা শেষ হলে আমি পুলিশ মহাশয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। তিনি বললেন, "আপনার অনুধাবন সত্য হবে কি কল্পনা হবে তা জানি না, তবে আমার পুলিশ রেকর্ড দেখে মনে হয়, কম্বোজ এবং ভিয়েতনামীরা তাদের সাধারণ শত্রু ফরাসীদের তাড়াবার জন্যও

একত্রে কাজ করতে একত্রিত হয় না। একে অন্যের শত্রুতা করতে পারলেই তারা সুখী হয়। তবে একথা বলতে পারি ভারতের মুসলমানরা যেমন হিন্দুনারী অপহরণ এবং হিন্দুদের মুসলিম ধর্মে কন্‌ভার্ট করতে পারলেই সুখী হয়, এখানে সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। এদের মধ্যে ইন্‌টার মেরেজ একটাও হয় না। যদিও উভয়ের একই ধর্ম তবুও তারা এসব ক্ষেত্রে একেবারে পৃথক থাকে। আপনি যখন তোরেন্স যাবেন, দেখবেন অনেকগুলি চীনা বিজয় স্তম্ভ সেখানে আছে। ফরাসী ঐতিহাসিকগণ বলেন চীনারা তোরেন্স নামক স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছিল এবং কম্বোজদের তোরেন্স হতে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তোরেন্সে কতকগুলি ইসলাম ধর্মাবলম্বি কম্বোজও আছে তাদের সংগে কয়েকদিন থাকবেন এবং তাদের আচার ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করবেন।”

তারপরই আরম্ভ হল আমার নিজের দেশের কথা। নিজের দেশের কথা বলতে আমার জিহ্বা যেন আরষ্ট হয়ে আসছিল। নিজের দেশের ভাল-মন্দ সবই জানতাম কিন্তু অপরকে তাই বলতে ইচ্ছা করতাম না। নিজের বদনাম অপরের কাছে বলাকে বলা হয় স্বীকারোক্তি। আমি তা পছন্দ করতাম না। সুখের বিষয় কথাটা উঠল মহাত্মা গান্ধি নিয়েই। মহাত্মা গান্ধির কথা বলতে বেশ ভালবাসতাম। সেজন্যই আমার জিহ্বায় খিল ধরে রইল না। মহাত্মা গান্ধির ইয়ং ইণ্ডিয়া হতে কতকগুলি সুন্দর কথা বলাতে পুলিশ অফিসারের বেশ ভাল লাগল বটে কিন্তু জান্‌তাম এরূপ ভালবাসার পেছনে কোনও গুরুত্ব নাই। ফরাসীরা তাদের দেশ এবং তাদের জাতের কথাই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়। মহাত্মা গান্ধির জন্ম যদি তাদের কলনীতে হ'ত তবে আর তাঁকে বেশিদিন বাঁচতে হত না। মহাত্মা গান্ধির ফিলোসফী বড়ই সুন্দর এবং দুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে উপহাসের জিনিস।

যারা জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বৎসরে লক্ষ লক্ষ শিশু হত্যা করতে পারে, যুবক যুবতীদের অকালে বৃদ্ধ করে, তাদের নফর চাকর মহাত্মা গান্ধির অন্তরের কথা কি করে বুঝবে? এদিকে চারটা বেজে গিয়েছিল। অনেকগুলি ক্ষুদে অফিসার দর্শন প্রার্থী ছিলেন। হঠাৎ দুভাষী মহাশয় উপস্থিত হলেন। তাকে পুলিশের বড়কর্তা আদেশ দিলেন, আমাকে যেন "একশত" ফ্রাংক দেওয়া হয়। আমি কিন্তু তা পাই নাই এমন কি পাবার জন্যও চেষ্টা করি নাই। এর একমাত্র কারণ হল বোরা সাহেব আমার জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাংকএর মত চাঁদা উঠিয়েছিলেন। একশত ফ্রাংকে দশ পেস হয়। তখনকার দিনে দশ পেস ছিল পনর টাকার সমান পনর টাকার জন্য এখানেসেখানে দৌড়ানো ভাল মনে করি নাই।

পুলিশ অফিসারের ঘর হতে বের হয়ে এসেই দেখি অনেকগুলি ভারতীয় ব্যবসায়ী আমার সংগে করমর্দন করার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন। প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীর সংগে করমর্দন করে হাতকাটার সন্ধানে বের হলাম। সে দোকানে ছিল না। কতক্ষণ পর সে এসেই বললে "বাজিমাত করে আসছ, আর তোমার পেছনে পুলিশ লাগবে না।" হাতকাটার কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই এবং পরে এমনও প্রমাণ পেয়েছিলাম যাতে করে মনে হয়েছিল ইন্‌টেলিজেন্ট ব্রান্‌চের লোক আমার পেছন লেগেই ছিল। হয়ত প্রকাশ্যে পারেয়ারীর সংগে কথা বলার জন্য তা হয়ে থাকবে।

সেদিন রাত্রেই কয়েকজন ভিয়েতনামীর সংগে সাক্ষাৎ হল। তারা আমাদের দেশের কৃষক এবং মজুরদের সন্ধান চাইল। আমি জানতাম তখনও আমাদের দেশের কৃষক এবং মজুর পাথরের মতই নির্বিকার হয়ে ধনীর দেওয়া মামুলী মজুরীতে প্রাণ বাঁচায়। ভিয়েতনামীরা যখন শুনল, জাতীয় আন্দোলন শুধু মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে তখন তারা মাথা চুলকিয়ে বিদায় নিল।

রাত্রে পারেয়ারী আসলেন। তাঁকে আমি কয়টি প্রশ্ন করি—তিনি সোভিয়েট রুশিয়ায়, সিংকিয়াং এর চীনের নব প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েটে কি দেখে এসেছেন। সোভিয়েট রুশিয়া সম্বন্ধে তার উচ্চমত, সিংকিয়াং প্রদেশে ইউরোপের কোন শক্তির প্রাধান্য হবে এবং চীনের সোভিয়েট সম্বন্ধে তার সংশয় এসব কথাই বিস্তারিতভাবে বললেন, পৃথিবীর লোক আগিয়ে চলছে, সেই অগ্রগতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। আমার সংগে কথা বলার সময় পারেয়ারীর হঠাৎ কি মনে হল তাই আমাকে নিয়েই তিনি জেনারেল পোষ্ট অফিসের দিকে রওয়ানা হলেন। জেনারেল পোষ্ট অফিসে গিয়ে তিনি তাঁর আত্মীয়ের কাছে এয়ারমেলে এ চিঠি পাঠালেন। তাঁর এয়ারমেলে চিঠি পাঠানো দেখেই মনে হল তাঁর ভ্রমণের শেষ এখানেই। লোকটির "হুমসিক্" রোগ হয়েছিল। আমারও মাঝে মাঝে "হুমসিক্" রোগ হত। যখনই আমি সেই রোগে আক্রান্ত হতাম তখনই দেশের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করতাম। "হুমসিক্" বড়ই মারাত্মক রোগ এতে অনেকের সর্বনাশ হয়। পারেয়ারীর চিঠি পোষ্ট হয়ে গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনার কি "হুমসিক্" রোগ হয়েছে?' পারেয়ারী পরিষ্কার ভাষায় বললেন "নিশ্চয়ই বন্ধু, আমার কাছে বিদেশ মোটেই ভাল লাগছে না। একবার দেশে গেলে যেন বাঁচি, অথচ দেশে যাবার মত টাকা কাছে নাই।" সেদিন রাত্রে পারেয়ারী ভিয়েতনামীদের আর্থিক দুর্দ্দশা কত নীচে নেমে গেছে তাই আমাকে দেখিয়ে দিতে লাগলেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় দেখাবার পর ফরাসীদের দোষী করতে ছিলেন। ফরাসী হয়ে ফরাসীদের দোষী করা আশ্চর্যের বিষয় বলতেই হবে। নিজের দোষ নিজেই যে বলে সে নিশ্চয়ই সৎলোক এটাই আমার ধারণা ছিল।

সাইগণের কাছেই কোলন্ বলে একটি শহর আছে। সেখানে চীনা ব্যবসায়ীরাই থাকে এবং তারা প্রায় সকলেই পাইকারী দরে

চীনা সিল্ক বেঁচাকেনা করে। একদিন একজন চীনা ভদ্রলোক আমাকে কোলন্ যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন? ভদ্রলোক নিজেই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কোলনে যাবার পর মনে হল যেন একটি ক্ষুদ্র চীনা শহরে এসেছি। দুদিকের বাড়ীগুলিতে চীনা ছেলে মেয়ে আনন্দে চিৎকার করছে, দোকানীরা বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে সিল্কের দর কশাকশি করছে। ভো ভো করে নানারূপ ওটোমবিল আসা যাওয়া করছে। ব্যবসায়ের ধুম লেগে রয়েছিল।

চীনা ভদ্রলোক আমাকে একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেটা নাকি বড় বড় চীনা ধনীদের ক্লাব। ঘরের মধ্যে যাওয়া মাত্র অন্ধকার মনে হতে লাগল। এরূপ ক্লাব আমি অনেক দেখেছিলাম বলে ভয় পাই নাই, অন্য লোক হলে ভয় পেত নিশ্চয়ই। ক্লাবের একটা বড় রুমে গিয়ে দেখি কয়েকজন লোক মাজাং খেলছে। তাদেরই পাশে বসিয়ে চীনা ভদ্রলোক আমার হাতে একটি ছোট চীনা চায়ের পেয়ালা উঠিয়ে দিয়ে বললেন "আমি এক্ষনই সিগারেট নিয়ে আসছি।" ভদ্রলোক চলে যাবার পর মাজাং খেলোয়ারদের একটি লোক বললে "অতএব আপনিই চীনে যাবেন?" আমি বল্লাম "ইচ্ছা আছে, যাওয়া হয় কি হয় না কে বলতে পারে। শুনতে পাচ্ছি চীনদেশে ডাকাত কিল্‌বিল্ করছে, সেখানে গেলেই বোধ হয় মৃত্যু হবে!" চীনা লোকটি রাগ করে বল্লেন "তাই যদি ধারণা করে থাকেন তবে দয়া করে চীন দেশে যাবেন না।" আমি বল্লাম "এখন চীনের কথা একটুও চিন্তা করি না এখন চিন্তা করি ভিয়েতনামীদের কথা। এদের আচার ব্যবহার জানবার জন্যই মনপ্রাণ ঠেলে দিয়েছি।"

"হাঁ। আচার আর ব্যবহার এদুটা কথা বড়ই সুন্দর। ভিয়েতনামীরা মাথা নীচের দিকে দিয়ে পা উপরে উঠিয়ে হাত দিয়ে হাটে এই ত দেখতে পাচ্ছেন, শুধু তাই নয় তারা ঘাস খায় আর শুকরের মত মাটিতে

ঘুমায় তাও দেখতে পাবেন। যদি না দেখে থাকেন তবে মনে মনে দেখে ফেলুন এবং সুন্দর করে একটা প্রবন্ধ লিখে নিজের দেশে পাঠিয়ে দেন, তবেই হবে দেশ ভ্রমণের সার্থকতা।

যারা মনের দুঃখে এরূপ কথা বলে তাদের কথায় প্রতিবাদ করতে নাই। সবই সহ্য করতে হয়। আমিও সহ্য করেলাম। যে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি সিগারেট নিয়ে আসলেন, তখন তাঁকে বল্লাম "আপনাদের ক্লাব ঘরটি দেখে বড়ই আনন্দিত হলাম। আশাকরি যখন উপন্যাস লিখব তখন আপনাদের ক্লাব ঘরটির দৃশ্য ফেনিয়ে অনেক পাতা লিখতে পারব।" ভদ্রলোক আমাকে ক্লাব ঘরটি ভাল করে দেখিয়ে বল্লেন, আরও ভাল করে দেখুন কালি কলমের সৎব্যবহার করতে পারবেন। সুখের বিষয় এর চেয়েও বড় বড় চীনা ক্লাব চীন দেশে যাবার পর দেখতে পেয়েছিলাম এবং সেই ক্লাব ঘরগুলির কথা মরণ বিজয়ী চীনে বলতে সক্ষম হয়েছিলাম।

যে ভদ্রলোক আমাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "ক্লাব ঘরটিই যদি আমাকে দেখাবার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে তবে কাজ শেষ হয়েছে, আমি এখন যেতে পারি।" তিনি বললেন "শুধু তাই নয়, ইউনান্ প্রদেশ হয়ে যদি চীনে যান্ তবে অনেক কিছু দেখতে পাবেন, আমার ইচ্ছা আপনি ইউনান্ হয়ে চীনে যান্। তাতে যদি রাজি হন তবে আপনাকে সাহায্য করব।" ভদ্রলোকে বল্লাম "এখনও আমার ভিয়েতনাম দেখা হয় নাই, ভিয়েতনাম দেখা হয়ে গেলে চীনদেশে কোন পথে প্রবেশ করি তার কথা ভাবব। একটি দেশ ভ্রমন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য দেশের কথা চিন্তা করতে সক্ষম হব না। আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করবেন।"

ক্লাব হাউস হতে বের হয়ে আবার রাজপথের উপর বেড়াতে আরম্ভ করলাম। চীনা এবং আনামিত (ভিয়েতনামী) কুলবধুরা

একটা ডোবার তীরে বসে কাপড় কাচচ্ছিল। এদের একে অন্যের মধ্যে কি পার্থক্য তাই লক্ষ্য করছিলাম। ভিয়েতনামী কুলবধূ পান চিবিয়ে মাথার খোপে ফুল দিয়ে কাপড় কাচায় ব্যস্ত ছিল। চীনা কুলবধূ মলিন মুখে আলুথালু বেশে জলে নেমে কাপড় পাথরে আছাড় দিচ্ছিল আর বিড় বিড় করে কথা বলছিল। চীনা কুলবধূ তার কামিজের দিকেও লক্ষ্য রাখছিল কারণ চীনা স্ত্রীলোকের অর্জিত টাকা পয়সা সংগেই থাকে। ভিয়েতনামী কুলবধূরা ঘরেতে পেটারার অথবা ঝাপির মধ্যে তাদের ধনদৌলত রাখে। চীনারা ঝাপি অথবা পেটারা মোটেই ব্যবহার করে না! আমাদের দেশে পূর্বে কেউ সিন্দুক ব্যবহার করত না, ঝাপি অথবা পেটারাই ব্যবহার করত। আরব এনেছিল সিন্দুক্। বর্তমানে পোর্টমেন্ট, সুটকেশ বৃটিশ এনে দিয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলাম চীনা কুলবধূ চীনা ভাষা না বলে ভিয়েতনামী কথাই ব্যবহার করছে। কাপড় কাচার সময় নানা রূপ গল্পও চলছে। ভিয়েতনামী কুলবধূ অনেক সময় কাপড় কাচার দিকে বিশেষ মন না দিয়ে গল্পেই মন ঠেলে দিচ্ছে। চীনা কুলবধূ কিন্তু যেমনটি কাপড়ে ডলা দিচ্ছে তেমনি গল্পও করছে।

এদিকের লোক হাঁসের চাষ করে। হটাৎ কোথা হতে একপাল হাঁস ডোবাতে নেমে পরল। অমনি চীনা রমণীরা হাঁসের মালিকদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল। ভিয়েতনামী স্ত্রীলোকগণ কাপড় কাঁচা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের দিকে রওয়ানা দিল। ঘরের দিকে যাবার সময় কিন্তু ওদের প্রত্যেকের বিকৃত মুখাকৃতি হয়েছিল। একটু পরই কতক-গুলি ছোকরা হাঁস তাড়া করতে আসল। তারা সকলেই ভিয়েতনামী। চীনা স্ত্রীলোকগণও ঢিল ছুড়তেছিল। চীনা স্ত্রীলোক নিজেই হাঁস তাড়াবার কাজ গ্রহণ করেছিল আর ভিয়েতনামীরা হাঁস তাড়াবার জন্য তাদের আত্মীয় স্বজনদের ডেকে এনেছিল। এতে চীনা

স্ত্রীলোক এবং ভিয়েতনামীদের মধ্যে মানসিক অবস্থার প্রভেদ আপনি ফুটে উঠেছিল।

ভিয়েতগামী স্ত্রীলোকদের পোষাকের সংগে চীনা স্ত্রীলোকদের পোষাকের ঢের পার্থক্য ছিল। পুরুষদেরও একই পার্থক্য। এখন পার্থক্যটা কি তাই বলতে পারছি না। যারা সাহিত্যিক অর্থাৎ ভাষার ভেতর দিয়ে বিষয় বস্তু ফুটিয়ে তুলতে জানেন তাদের স্মরণগত হওয়া দরকার। আমার দ্বারা কিন্তু এসব সম্ভব নয়। তাই চেষ্টা করে দেখি পার্থক্যটা বলতে পারা যায় কি না। আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এক রকমের কামিজ ব্যবহার হত তাতে বোতাম ব্যবহার হত না এবং এমন কি সূচেরও দরকার হত বলে মনে হয় না। এক খণ্ড চতুষ্কোন কাপড়কে গলায় এবং পিঠে জড়িয়ে চারটা কোণার সংগে গাট বান্দলেই চলত। বিদেশ হতে সূচের আমদানী হবার সংগে সংগেই চতুষ্কোণ কাপড়টি আর সেই অবস্থায় না থেকে দুদিকে দুটা হাতও যোগ হল কিন্তু রসির বাঁধন আর অপসরণ হল না। নেপালী ব্রাহ্মণেরা এখনও সে ধরণের কামিজ ব্যবহার করে। ভিয়েতনামীরাও সেই অনুকরনেই গাত্র বস্ত্র ব্যবহার করে। চীনাদের পাজামাতে যেমন ইজারবন্দ থাকে না, হয় বেল্টের সাহায্যে নয়ত একটি পাতলা রসির সাহায্যে পাজামাকে কোমরে আটকিয়ে রাখে ভিয়েতনামীরা সেরূপ কিছুই করে না। তাদের পাজামার কোমরের দিকটা এতই প্রশস্ত যে আমরা যেমন করে ধুতি পরি তেমনি করে তারাও পাজামাটা কোমরে আটকাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভিয়েতনামীরা যদিও মোংগল তথাপি ভারতের সংগে তাদের বেশ সম্বন্ধ হয়েছে। চীনারা চপ্ষ্টিক্ দিয়ে খাবার খায় ভিয়েতনামীরা তা না করে হাতের সাহায্য নেয় এবং ভারতীয় প্রথায় মাছ এবং মাংসের তরকারী পাক করে। বর্তমানে ভিয়েতনামীরা চীনা এবং ফরাসীদের সংস্পর্শে এসে কাটা চামুচ অথবা

চপষ্টিকই ব্যবহার করে।" অবশ্য শহরে, গ্রামে এখনও হাতেরই ব্যবহার চলে। আরম্ভ করেছিলাম ভিয়েতনামী নারীদের আচার ব্যবহারের কথা বলতে কিন্তু এসে গেল অনেক কথা। এখানে দেখতে পেলাম মানুষের আচার ব্যবহার তাদের আর্থিক উন্নতির উপর সমূহ নির্ভর করে অতএব আচার ব্যবহার এবং কৃষ্টি চিরস্থায়ী নয়।

কোলন্ বড় শহর নয়। নদী তীরে অবস্থিত বলে এখান থেকে আমদানি রপ্তানি হয়। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা গলিপথে ভ্রমণ করা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না উপরন্তু ভিয়েতনামীরা আমাকে ভারতীয় সেপাই বলে সন্দেহ করত।

সাইগণের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। শহরে যে কোন লোক প্রবেশ করার পর কতকগুলি শিল্প ব্যবসায়ী দেখতে পেয়ে সকলেই মনে করে ভারতবাসীরা সকলেই শিল্প ব্যবসায়ী, কিন্তু শহরের গলিতে কতকগুলি ছোট্ট বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। সেই বাড়ীতে যারা থাকে তারা সুদে টাকা খাটায় এবং এর জমি কিনে তার কাছে বিক্রি করে। ব্যবসাটি যদিও দেখতে বড়ই সুন্দর কিন্তু এদের অত্যাচারে ভিয়েতনামীরা হয়রান হয়ে পড়ছিল। শুধু তাই নয় এই ছোট্ট ঘরগুলির ভারতীয় বাসিন্দারা প্রগতিশীল ভিয়েতনামীদের গন্ধ পেলেই ধরিয়ে দিত। এতে ইণ্ডিয়ানদের সাইগণে অত্যধিক বদনাম হয়েছিল এবং ভিয়েতনামীরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, ফরাসীদের সংগে ভারতীয় চেট্টিদেরও তাড়াতে হবে।

চেট্টিরা ভয়ানক সনাতনী। সনাতনীদের উত্তর ভিয়েতনামে প্রবেশ নিষেধ ছিল। সেজন্য চেট্টিরা উত্তর ভিয়েতনামে যাবার সময় কোট পেন্ট পড়ে যেতে বাধ্য হত। সনাতনীদের আচার ব্যবহারও অপরিষ্কার সেজন্য চেট্টিদের পরিষ্কার ঘরে এবং পরিষ্কার হয়ে থাকতে বাধ্য করা হত। ছুৎমার্গ বলে কিছুই মানতে দেওয়া হত না। সুখের

বিষয় তামিলরা সরকারী আদেশ মান্য করাতে থাকায় ফরাসী সরকার যেরূপ আদেশ দিয়েছিল, সেরূপ ভাবেই থাকতে সক্ষম হয়েছিল।

সাইগণে যতগুলি চেট্টি পরিবার ছিল তাদের প্রত্যেকের সংগে দেখা করেছিলাম এবং তাদের সম্বন্ধে সাধারণ লোক যেরূপ মনের ভাব পোষণ করে তাও বলেছিলাম। তারা আমার কথা শুনে বলত, যতদিন ফরাসীরা এদেশে রাজত্ব করবে ততদিন তারাও এদেশে থাকবে। ফরাসীদের সংগে সংগে তারাও এদেশ ত্যাগ করবে।

মধ্য-ভিয়েতনাম

রক্ষিতা নয়, রক্ষক

সবেমাত্র আমরা ইন্দোচীন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার আগ্রহ প্রকাশ করছি। ইন্দোচীনের কতক অংশ নিয়ে ভিয়েতনাম গড়তে আরম্ভ হয়েছে। যখন ভিয়েতনাম বলে কোন শব্দের সৃষ্টি হয় নি তখন আমি সে দেশে গিয়েছিলাম। অনুভব করেছিলাম আনামিতদের ফরাসীরা শুধু ঘৃণাই করে না, আনাম শব্দটাকে মুছিয়ে ফেলার সংকল্প করেছে। আনাম ভাষার বৃদ্ধি রোধ করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চলছিল। সেই অপচেষ্টা দেখে বৃটিশের বাংগালী বিদ্বেষের কথা মনে হচ্ছিল। ১৯১৯ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী নন-কো-অপারেশন মুভমেন্ট করছিলেন তখন ভারতের পল্টনে পল্টনে বাংগালী বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি করে ইন্দোচীনের সর্বত্র ফরাসীরা আনামিত বিদ্বেষ, কম্বোজ, পার্ব্বত্য জাতি এবং মালয়দের কাছে প্রচার চলছিল। শুধু তাই নয় আনামদের দুঃখ এবং কষ্টের কথা পৃথিবীর লোকের কাছে যাতে না পৌছতে পারে সেজন্য ইন্দোচীনে অনবরত ডাকাতি হচ্ছে এবং ডাকাতদের ধরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, সে কথাই প্রেসের সাহায্যে প্রপাগান্দা করা হত। কিন্তু সেজন্য প্রগতিশীল চীনা, কোরিয়ান, জাপানী এবং ইন্দোনেশিয়ানদের কাছে সত্য সংবাদ কখনও গোপন থাকত না। প্রায়ই উল্লিখিত দেশগুলি হতে ইন্দোচীনে বিষয়টা কেমন দাঁড়াচ্ছে সে সংবাদ নেবার জন্য লোক আসত। একজন ইন্দোনেশিয়ানও ইন্দোচীনে ফরাসীদের অত্যাচার দেখবার জন্য এসেছিলেন। তিনি নাকি সাইগনে কয়েক সপ্তাহ থাকার পর একেবারে নির্বাক হয়ে যান। লোকে তাঁকে পাগল বলেই ধারণা করছিল এবং ডাচ্ কনসালকে কথিত ইন্দোনেশিয়ানের

দুর্দ্দশার কথা জানিয়েছিল। ডাচ্ কন্সাল এই লোকটির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

লোকটির দেশ নাকি সামারং ছিল। তিনি সেখানে পৌছানর পর পূর্বের মানসিক দুর্বলতা রোগেই কষ্ট পেতেছিলেন। কিন্তু তিনি কোথাও বসে থাকতেন না। পাড়ায় পাড়ায় হেঁটে স্থানীয় পাচিকাদের একটি লিষ্ট তৈরী করার পর হঠাৎ তার মুখ খুলে যায়। তিনি পাচিকাদের এক সভায় আহ্বান করেন এবং সেই সভায় তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা তাদেরই কাছে বলেন। পাচিকারা তাদের দুঃখ কষ্টের কথা অপরের মুখ হইতে যখন শুনতে পেল তখন তাদের হুঁস হল এবং অনেকেই নিজের কথা ভেবে কেঁদে ফেলল। এর পর থেকেই পাচিকাদের এক এসোসিয়েশন্ গড়ে উঠে এবং সেই এসোসিয়েশনের প্রভাবে পাচিকাদের মাইনে পাঁচ রুপিয়া হতে দশ রুপিয়াতে পৌছে।

ইন্দোনেশিয়ান কর্মীর পক্ষে আনামিতদের অবস্থা দেখে হতভম্ব হবার কথাই ছিল এবং যে কোন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের তা হবারই কথা। কোন্ দেশে একজন লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা বিচারে হত্যা করে? অন্তত লোক দেখানো বিচারের প্রহসন সভ্য দেশে হয়ে থাকেই, ফরাসীরা ইন্দোচীনে তাও করত না সে কথাটাই আমি অনেকের মুখে শুনতে পেয়েছিলাম। তবুও—গিলটিনে মরণকে বরণ করে আনামিতরা তাদের কাজ নিরাপদে চালিয়েছিল।

মঁসিয়ে পারেয়ারী এদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন বলে তাকে একরূপ আটক করেই রাখা হয়েছিল! মঁসিয়ে পারেয়ারী আমার সাইগন হতে বিদায়ের দিনে BIEN-HOA বেন্-হো পর্য্যন্ত আসার অনুমতি পান। পথে দুবার তার সাইকেল পাংচার হয়! উভয় বারেই তিনি যেরূপ অধৈর্য প্রকাশ করেন তাতে মনে হয়েছিল তিনি আর ভ্রমন করতে সক্ষম হবেন না। সাইগন হতে বেন্-হো মাত্র বত্রিশ

কিলোমিটার। বত্রিশ কিলোমিটার আসতেই তাকে বেগ পেতে হয়েছিল। তার মানসিক দুর্বলতা অনুভব করেও কিছুই বলি নাই। একটি হোটেলে এসে তাকে বিশ্রাম করতে দিয়ে আমি অন্য হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত করে সে দিন আমি বেন্-হোতেই থাকব ঠিক করেছিলাম সেজন্য নিশ্চিন্ত মনে স্নানাহার করে পারেয়ারীর সংবাদ নিতে যাই। হোটেলে এসে দেখি তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তার কাছে যে খাবারের মত অর্থ ছিল না তা আমি জানতাম না। তিনি যখন তার আর্থিক দুরবস্থার কথা বললেন তখন আমি তৎক্ষণাৎ তাকে একটা রেঁস্তোরায় গিয়ে খাবারের বন্দোবস্ত করে দেই এবং ফিরে যাবার সময় হাত খরচ বাবদ এক পেসো দেই। এতে পারেয়ারী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ভারতবাসীদের সংগে রুশদের তুলনা করেন এবং বলেন রুশ মজুর এবং চাষাদের মন ভারতবাসীর মতই। তারা পথচারীর অভাব অভিযোগ বেশ ভাল করেই বুঝতে সক্ষম হয়।

পারেয়ারী বিকাল বেলা চলে যাবার সময় আমাকে স্থানীয় ফরাসী-দের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলেন। তার কথা শুনে দুঃখিত হয়েছিলাম এবং ফরাসীদের কাছ থেকে দূরে থাকাই মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু যখন ফ্রান্সে গিয়েছিলাম তখন ফরাসী. কৃষক, মজুর এবং মধ্যবিত্তদের সংগে মেলামেশা করে আনন্দ অনুভব করেছিলাম। ফ্রান্সে ফরাসীরা প্রায়ই নির্যাতিত এবং সেজন্যই তারা বিদেশীদের নির্যাতন করার বদলে সাহায্য করেই সুখী হয়।

পারেয়ারী বিদায় নেবার পর স্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগে দেখা করি এবং পথের সন্ধান নেই। তারা বললেন এখান থেকে যদি আমি ট্রেনে করে ফান্থিয়েট যাই তবে অনেক কিছু দেখতে পাব। তাদের প্রস্তাবে রাজী হতে পারিনি তার কারণ হল, পার্ব্বত্য পথে আমার আরও কিছু দেখার ছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ভাবছিলেন

পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করতে আমি ভয় পাব কিন্তু তারা জানত না জন-মানবহীন শ্যামদেশের জংগলে অনেক দিন একাকী কাটিয়ে এসেছিলাম। বিকাল বেলা তারা চাঁদা উঠিয়েছিলেন এবং রাত্রে খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ব্যবসায়ীদের বলে এসেছিলাম যার বাড়ীতে রাতে খাব তারই বাড়ীতে যেন চাঁদার টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয় কারণ পরের দিন প্রত্যুষে (Chua Chen) চুয়াচেনের দিকে রওনা হতে হবে। চুয়াচেন ফান্‌থিয়েট হতে প্রায় একশত কিলোমিটারেরও বেশী দূরে অবস্থিত।

ভুল আমার প্রায়ই হত। সে ভুল হতে রক্ষা পাবার জন্য বড় তিনখানা রুটি কিনে সাইকেলের বাক্সে রেখে দিলাম এবং তারপরই স্থানীয় মজুর সভার একজন সভ্যের সন্ধানে বের হলাম। এখানকার ভাললোক সাধারণতঃ মামুলী পোষাকে রেঁস্তোরাগুলিতে আড্ডা দিতে ভালবাসেন কাজেই ঠিকানা মতে তাকে বের করতে বেশি দেরী হল না। আমার সংগে একখানা পরিচয় পত্র ছিল। সেই সংগের পত্রখানা তার কাছে দেবা মাত্র পত্রখানা পকেটস্থ করে ফরাসী ভাষায় আমার সংগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তারপর হঠাৎ উঠে বললেন চলুন আপনাকে হোটেলে পৌছে দিয়ে আসি। হোটেলে এসে তিনি ইংরেজিতে কথা বললেন। তার কথা বুঝতে পেরে আমি অনেকটা শান্তি পেয়েছিলাম। তিনি যখন শুনলেন আমি আগামীকল্য চুয়াচেনে যাব তখন তিনি তার পত্রের উপরই একজন মালয় স্ত্রীলোকের নাম ও ঠিকানা দিয়ে বললেন চুয়াচেনের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি মালয় স্ত্রীলোকটির সংগে দেখা হলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। তিনি একজন ফরাসী ভদ্রলোকের রক্ষিতা। রক্ষিতা বলে তাঁকে ঘৃণা করবেন না। দেখতে পাবেন এই রক্ষিতা চুয়াচেনে কিরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে দেখার মত কিছুই নেই। আমার মনে হয় আপনি আজ বিশ্রাম করুন এবং আগামী কল্য খুব ভোরে ঘুম

থেকে উঠে চুয়াচেনের দিকে রওনা হন। আমি বললাম, তাই হবে বন্ধু।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে পারি নাই। ঘুম থেকে উঠে দেখি সূর্য অনেকটুকু উপরে উঠে গেছে। গাছের পাতায় পাতায় তার সোনালী কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে। চট্‌পট্‌ করে হোটেল হতে বের হলাম। পথে এসে দেখি কতকগুলি বয়স্ক বালিকা মাঠের দিকে রওনা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি পেটেরা। পেটেরায় খাদ্য রয়েছে। তারা আজ বনভোজন করবে। আজ বোধ হয় রবিবার নতুবা এরা বাইরে যাবে কেন? প্রত্যেকটি যুবতীর গলায় ক্রস্ ঝুলানো রয়েছে। বনভোজন এদেশে প্রচলিত ছিল না, ফরাসীরা এদেশে বনভোজনের প্রচলন করেছে।

বালিকারা ধীর পদনিক্ষেপে চলেছে। তাদের গলায় ঝুলানো ক্রস্ প্রত্যেক পদনিক্ষেপে নড়েছে কখন বা একটু ছিটকিয়ে গিয়ে বুকের উপর মৃদু আঘাতও করছে। প্রত্যেকটি বালিকাকেই দেখলে মনে হয় তারা ঘরের বাইরে কোথাও যায় না, এবং আরামে প্রতিপালিত। এদের প্রত্যেকের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন কতকগুলি সাদা গোলাপ ফুল। সাদা গোলাপগুলি বেশীক্ষণ আমার মনে স্থান পেল না। কতকগুলি ছেঁড়া এবং ময়লা কাপড়ে আবৃত স্ত্রীলোক অতি কষ্টে তাদের শাকের বোঝা মাথায় করে শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে অনেক যুবতীও ছিল। যুবতীদের দেখলেই মনে হয় যৌবন বলে কিছু আছে বলেই তাদের শরীরে তার ছাপ লেগেছে কিন্তু যৌবন বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি। রোগ, অল্পাহার, অভাবের চিন্তা এসব তাদের কাহিল করে দিয়েছে। কারো যৌবন অসময়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, কারো যৌবন এসেছে আর কারো বা আসবে আসবে করছে। এই ত গেল তাদের মুখাকৃতি কিন্তু চরণযুগলের দিকে তাকালে মনে হয় তাদের

মরণের কথা। অনেকেরই পায়ে ক্ষত, ফাটল, চর্মরোগ এসব ত আছেই উপরন্তু পায়ের সংগে মাছির দলও যেন সহরে বাজার করতে চলেছে। এই মেয়েরাই যদি একটু উপদেশ, একটু আর্থিক সাহায্য পেত তবে কি তারা পূর্ববর্ণিত যুবতীদের সমকক্ষ হতে পারত না?

সুখ এবং দুঃখের সমাবেশ কলোনিয়াল দেশগুলিতে একেবারে ভরপুর দেখে হয়রাণ হয়ে পড়েছিলাম আরও যে কত দেখব তা কে বলতে পারে! আমিও মানুষ, অতএব আমারও রমণীর প্রতি দৃষ্টি-লোলুপতা খুবই ছিল কিন্তু রমণীদের দুর্দ্দশা দেখে আমার সমস্ত আকর্ষণ লোপ পেয়েছিল। উভয়রকমের যুবতীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে চললাম। কয়েক কিলোমিটার যাবার পরই পাহাড়ী পথ আরম্ভ হল। পাহাড়ী পথ উঁচু হতে উঁচুতে এগিয়ে চলছিল, বেশীক্ষণ এগিয়ে যেতে পারছিলাম না। তবুও ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার করে এগিয়ে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে হয়ে পড়লাম তখন দেখলাম পঁচিশ কিলোমিটার চলে এসেছি। আর চলতে ইচ্ছে হল না। ভাবলাম পথের পাশে কোথাও শুয়ে থাকি। শোবার মত অনেক স্থান খুঁজলাম, কিন্তু উপযুক্ত স্থান না পেয়ে দুঃখিত হয়ে এগিয়ে চলাই স্থির করলাম। কতক্ষণ যাবার পরই পেলাম গভীর বন। বনে ভয়ের কিছুই ছিল না। ফরাসীদের ভয়ে বনের জানোয়ার পালিয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হল। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ শুনা যাচ্ছিল। পথের পাশ দিয়ে কুলু কুলু রবে একটি ছোট্ট নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই নদীর জল পেট ভরে খেয়ে সংগের রুটিখানারও সদ্ব্যবহার করে পথেরই পাশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর আবার পথ চলতে সুরু করলাম। এরূপ জনহীন পথে চলতে মন এগোচ্ছিল না তবুও চলতে হচ্ছিল।

কতক্ষণ যাবার পর একটি পরিত্যক্ত ঘর পেলাম। সেখানে আবার বিশ্রাম নেবার পর যখন আবার চলতে আরম্ভ করলাম তখন সূর্য পশ্চিমে

চলে পড়েছিল। ভাবছিলাম আজ আর লোকালয়ের সন্ধান পাব না। ভগ্নোৎসাহ হলে শারীরিক শক্তিও অনেকটা কমে আসে, আর চলতে পারছিলাম না। অবশেষে সন্ধ্যার পূর্বেই পথের উপরে রাতকাটানোর জন্যে শুকনা কাঠ কুড়িয়ে একত্রিত করতে আরম্ভ করলাম। অনেকগুলি শুকনা কাঠ একত্রিত করে যখন আগুন ধরাতে যাব তখন কোথা হতে দুজন অর্দ্ধসভ্য লোক দৌড়ে আসল এবং তাদের বাড়ীতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

দুজনারই পরিধানে মলিন বস্ত্র, তাও আবার কোমর হতে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত। তাদের হাতে, পায়ে, মাথায় কোথাও উল্‌কী দেখতে পেলাম না। চুল খাটো দেখে মনে হল এদের মধ্যে নরসুন্দর প্রচলন আছে। তাদের হাতে ধারাল দা ছিল কিন্তু দা হাতে রাখার কায়দা দেখে মনে হল তারা সত্যই আমার কোনও অনিষ্ট করবে না। তাদের সংগে চলাই সংগত হবে মনে করে আগুন নিবিয়ে ফেললাম। আগুন নিবাতে তারাও আমায় সাহায্য করল। তাদের সিগারেট দেওয়ায় তারা খুবই সুখী হল এবং সাইকেলখানা তারাই ধরে এগিয়ে চলল। কতক্ষণ যাবার পর বনের পাশে একটি গ্রাম দেখতে পেলাম। এই গ্রামেই তারা থাকে।

গ্রাম একটু উঁচু স্থানে অবস্থিত। অনেকগুলি ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের দেওয়াল পাতার সাহায্যে আচ্ছাদিত। পাতাগুলি বেশ পুরু। ঘরগুলি যেভাবে তৈরী হয়েছে এরূপ ঘর পূর্ববংগ হতে আরম্ভ করে আসামের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। একটি ঘরে গিয়ে বসার পর একজন আমার জন্য জল নিয়ে আসল। হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করার পর গ্রাম্য খাদ্য এনে হাজির করল। তাতে ভাত ও শুকনা মাছ ছিল। তাই খেয়ে তৃপ্ত হলাম। তারপরই গ্রামের লোকগুলি তীরধনু নিয়ে আমার সামনে আসল এবং একজন লোক তার তীরধনু আমার হাতে দিয়ে ধনুতে তীর

যোজনা করতে বলল। ধনুতে তীর যোজনা করব দূরের কথা, কোন মতেই আমি ধনুতে গুণ পর্যন্ত পরাতে পারলাম না দেখে সকলেই একটু হাসল তারপর একজন ধনুতে গুণ দিয়ে একটি তীর উপরের দিকে ছুঁড়ে মারল। হিসেব করে দেখলাম গাদাবন্দুকের গুলি হতে এদের তীর সত্বর এবং দূরে যায়। তারপর আরম্ভ হল একে অন্যে প্রতিযোগিতা। যারা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে দশ সেণ্ট করে পুরস্কার দিয়েছিলাম। যারা আমাকে গিয়ে এনেছিল তাদের দিলাম কুড়ি সেণ্ট করে। গ্রামের স্ত্রীলোকগণ পালিয়ে গিয়েছিল। পালাবার কারণও ছিল। ফরাসী সেপাইরা গ্রামে এসে অত্যাচার করে। অত্যাচার হতে রেহাই পাবার জন্য বনের অসভ্যরাও দুঘরা গ্রাম তৈরী করে। এক স্থানে থাকে পুরুষ আর অন্যস্থানে থাকে স্ত্রীলোক। অর্দ্ধ সভ্য লোকও নিজেদের মা বোনদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করে কিন্তু আমরা এমনই এক সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি যে সমাজের লোক শুধু মা বোনদের বহিষ্কার করাই জানে, গ্রহণের কোনও ক্ষমতা রাখে না।

যে দুজন অর্দ্ধসভ্য আমাকে পথ হতে নিয়ে এসেছিল, তারাই আমার পাশে শুয়েছিল এবং পরের দিন তারাই আমায় পথে নিয়ে গিয়ে বিদায় জানিয়েছিল। অর্দ্ধসভ্যদের বর্বরতা আছে সত্যি কিন্তু ভারতীয় সভ্য সমাজে অর্দ্ধসভ্যদের প্রতি ঘৃণা নেই, আছে হিংসা। হিংসার উৎপত্তি স্থল হল দৈন্যতা।

অর্দ্ধসভ্যরা রেধে পাতায় ভাত দিয়েছিল। ভাতের সংগে মুরগীর ডিম সিদ্ধ এবং কাঁচা লঙ্কা ছিল। অর্দ্ধসভ্যরা কখনও হাঁসের ডিম খায় না। তাদের ধারণা হাঁসের ডিম এবং মাংস উভয়ই পিত্তশূলের একমাত্র কারণ। অবশ্য কথাটা পরে জেনেছিলাম।

দ্বিপ্রহরে যখন ক্ষুধাতুর হয়েছিলাম তখন অর্দ্ধসভ্যদের দেওয়া ভাত খেয়ে শরীরে নবচেতনা পেয়েছিলাম এবং বিনা কষ্টে চিউচেনে

পৌঁছেছিলাম। চিউচিনে পৌঁছে একটা ফরাসী হোটেলে স্থান নেই। শুধু থাকবার জন্ম তিন টাকা দিতে হয়েছিল। হোটেলের ম্যানেজার মহাশয় ছিলেন কর্শিকান। তিনি ছিলেন বর্ণাভিমানী কিন্তু বর্ণাভিমান ফরাসীদের কালোনীর মধ্যে পর্যন্ত অচল। আমাকে দেখা মাত্রই তার নাকটা যেন উঁচু হয়ে উঠত। তাকে বিরক্ত করবার জন্মই আমি বার বার বয়কে ডাকতাম। বয় আসত আর হাসত। অবশেষে ম্যানেজার মহাশয় আমার রুমে এসে ভদ্রভাবে বললেন "বার বার বয়কে ডাকলে কাজের বিশেষ ক্ষতি হয়।" বললাম—আমি চাই ভদ্রতা যা চেয়েছি তাই পেয়েছি অতএব বয়কে আর ডাকব না।

পরের দিন বেলা দশটার সময় মালয় রক্ষিতার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে রক্ষিতার সংগে সাক্ষাৎ করলাম। ফ্রেন্‌চম্যান্ বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি প্রথমতই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন তার রক্ষিতার সংগে আমার কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা। আমি চট্‌পট্ করে বললাম, যে গ্রামে তার রক্ষিতার জন্ম আমি সে গ্রামে বর্দ্ধিত হয়েছি। সম্পর্কে তার রক্ষিতা আমার বোন হয়। আমার কথায় ফ্রেন্‌চমানের মুখ আনন্দে নেচে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে তার রক্ষিতার ঘরে নিয়ে বসিয়ে নিজ হাতে একটা কেক্ এনে আমার সামনে রাখলেন। আমি মালয় রমণীর সংগে দেখা করব সে সংবাদ সপ্তাহ পূর্বেই রক্ষিতা পেয়েছিলেন।

রক্ষিতা সর্বপ্রথমই আমাকে "আবাং" বড় ভাই বলে সম্বোধন করলেন এবং নিজ হাতে কাফি তৈরী করে খেতে দিলেন। আমরা যখন কাফি খাচ্ছিলাম তখন মালয় দুহিতা দুঃখ করে বলেছিলেন নিজের দেশে কিছুই করতে পারছিলাম না। ঘটনাচক্রে এখানে এসেছি এবং এখানে এসেই এমন একদল যুবক যুবতীর সংগে আত্মীয়তা করেছি যেজন্য হয়ত একদিন গিলটিনে যেতে হবে। সে যা হবার তাই হবে আমি কিন্তু তোমার সাহায্য চাই।

কিরূপ সাহায্য বোন্?

আমি তোমাকে নিয়ে অনেক ফ্রেন্চ ম্যানের কাছে যাব, তারা অকাতরে তোমায় অর্থ দেবে, সেই অর্থ হতে তোমাকে এক পয়সাও দেব না—আমাদের কাজে তা ব্যয় করব, এতে কোনও আপত্তি নেই ত?

নিশ্চয়ই নেই বোন, আজই চল—আগামী কল্য এখান থেকে চলে যেতে চাই।

তা হতে পারে না, এখান থেকে কাল যাওয়া কিছুতেই হবে না। চাঁদা উঠাতে দুদিন লাগবে তারপর আর একদিন তোমার বিশ্রাম, তিন দিনের খরচ আমরা দেব এবং এখান থেকে ফান্থিয়েট পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া দেব এতে তোমার পথশ্রমও কমবে।

আমি বোনের কথায় রাজী হলাম এবং হোটেল বয়ের সংগে যাতে আগাগোড়া সম্বন্ধ রাখেন সে কথা বলে পুন হোটেলে এসে শুয়ে থাকলাম। বড়ই পরিশ্রান্ত ছিলাম। পা দুখানা টন্‌টন্ করছিল। বয়কে গরম জল নিয়ে আসতে বলছিলাম। সে গরম জলে পা দুটা ভাল করে টিপে চারখানা টাওয়েল গরম জলে ভিজিয়ে তা নিংড়িয়ে পা দুটাতে জড়িয়ে দিয়েছিল। দুমিনিট পরই আমার পায়ের ব্যথা লোপ পেয়েছিল। যখনই পায়ে ব্যথা করত তখনই বয়ের কাছ থেকে শেখা উপায় অবলম্বন করতাম এবং বেশ শান্তি পেতাম।

বিকাল থেকেই চাঁদা উঠাতে আরম্ভ করলাম, ভারতবাসী, ফরাসী, আরব, চীনা, সকলেই মুক্ত হস্তে চাঁদা দিতে লাগল। পরের দিন বিকালবেলা হিসাব করে দেখলাম প্রায় চার শত পেশো (আমাদের ছয়শত টাকা) চাঁদা উঠেছে। আমার আশেপাশে যত আনামিত থাকত তাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না, অনেকেই আমাকে দেবতার স্থানে বসিয়ে দিল। আনামিতরা তাদের বাড়ীতে আমায় নিয়ে গিয়ে তাদের যা সুখাদ্য তাই খেতে দিল। এই টাকা দিয়ে দুজন ভিয়েত-

নামীকে বিদেশে পাঠানো হবে, তারা চীন হয়ে সোভিয়েট রুশিয়ায় যাবে। দিনটা বেশ আনন্দেই কাটল। পরের দিন মালয় রমণী আমার হোটেলে এসে নানা কথার অবতারণা করলেন। আমার সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। দুজন আনামিত যুবক আমায় আপনজন মনে করে জাপটিয়ে ধরল। তাদের চেয়ারে: বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম সোভিয়েট রুশিয়ার এমন কি আছে যে সেখানে না গেলেই চলে না? তারা বলল গেলে অনেক কিছু জানা যাবে, সেইজন্যই আমরা দুজন লোককে সেখানে পাঠাব। এ সম্বন্ধে আমি আর কিছুই বললাম না। যা দেবার তা দিয়েছি এখন এই টাকা দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুক।

বেশী প্রশংসা আমি সহ্য করতে পারি না সেজন্য হোটেল হতে বের হয়ে নিকটস্থ একটি পেগোডায় গেলাম এবং ভিক্ষুকদের সংগে কথা বলে সময় কাটিয়ে বিকালের দিকে হোটেলে ফিরলাম। হোটেলে বয় আমার জন্য খাদ্য এনে রেখেছিল। রক্ষিতা মালয় রমণী "সায়র মানিস" এক প্রকারের সবজি পাক করে পাঠিয়েছিলেন। এই সবজি মুখরোচক এবং রক্তবর্দ্ধক। স্থানীয় ভারতবাসীরা রাত্রে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। চারদিক থেকে আদর আপ্যায়ন ক্রমাগত আসছিল। এতে আমার মনে একটুও আত্মশ্লাঘার উদ্রেক হয় না বরং আরও ভাল করে যাতে পর্যটন করতে পারি সেদিকেই আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম। পরের দিনটাও কেটেছিল ভাল। তার পর দিন সকাল বেলা যখন পথে বের হলাম তখন সর্বপ্রথমই আমার সামনে আসল একটা বড় চড়াই।

সাইনবোর্ডে লেখা ছিল কুড়ি কিলোমিটার চড়াই মাঝে "সার্প কার্ভ" আছে, সাবধান। কুড়ি কিলোমিটার চড়াই ঠেলে উঠা এটাই আমার ভ্রমণ জীবনের সর্বপ্রথম ধাপ এবং এ চড়াই ঠেলে উঠতেও সক্ষম হয়েছিলাম। মাইলের পর মাইল কখন সাইকেল ঠেলে আর কখন বা সাইকেলে চেপে এগিয়ে চলছিলাম। শরীর এতে ক্রমেই কাহিল হচ্ছিল।

কিন্তু মনে প্রবল উৎসাহ থাকায় কুড়ি কিলোমিটার পথ যখন ঠেলে উঠলাম তখন মনে হল আমি এক অপরূপ স্থানে এসেছি। ডানদিকে বিশাল সমুদ্র আর বাঁদিকে প্রশস্ত সমতল ভূমি। প্রশস্ত সমতল ভূমিতে বৃক্ষ নেই বললেই চলে। সূর্যকিরণ তত প্রখর বলে মনে হচ্ছিল না। আকাশ বেশ পরিষ্কার। চড়াই উঠা শেষ করে অনেকক্ষণ বসে বিশ্রাম নিলাম। ডাইনে বায়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম। পরিশ্রমের পর বেশ আনন্দ হল। মনে হয়েছিল এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি থাকতে পারে!

আজ যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে বলুন ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে কোচীন চীনকে একত্রিত করা উচিত হবে কি? আমি তার উত্তরে বলব নিশ্চয়ই উচিত। প্রকৃতপক্ষে চুয়াচেন থেকেই ভিয়েতনামের আরম্ভ হয়েছে। ফান্‌থিয়েট যাবার পথে কয়েকটি স্মৃতিসৌধ চোখে পড়েছিল। ফান্‌থিয়েট এবং চুয়াচেনের মধ্যবর্তী জায়গায় মালয়োশিয়ান্ এবং চীনাদের মাঝে যে লড়াই হয়েছিল তারই স্মৃতিচিহ্ন এখনও পড়ে আছে। এই যুদ্ধগুলি কখন হয়েছিল আমি তার সন্ধান নিই নাই। এসব আমার জানার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যুদ্ধ হয়েছিল, লোকও মরেছিল এবং এসব কাজের ফলে মানুষের কি পরিবর্তন হয়েছিল তাই আমি দেখছিলাম। মালয় এশিয়ান্ এবং চীনাদের সংঘর্ষের ফলে আনাম বলে এক নুতন জাতের সৃষ্টি হয়েছিল। নরডিক এবং অন্যান্য কতকগুলি নুতন জাতি বর্ণশংকরের ভয়ে কাঁপে কিন্তু আনামদের দেখে মনে হচ্ছিল বর্ণশংকরগণ মূলজাতি হতে শিক্ষায় সভ্যতায় উন্নত হয়। কম্বোজরা এখনও তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাস করে, আনামীরা ঔষধের উপরে নির্ভর করে। কম্বোজরা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অকালে মরে আর আনামীরা নির্দ্ধারিত খাদ্য খেয়ে সুস্থ শরীরে অনেক বৎসর বাঁচে।

সন্ধ্যার পূর্বেই ফান্‌থিয়েট্ পৌঁছলাম এবং পূর্ব নির্দ্ধারিত হোটেলে

গিয়ে স্থান নিলাম। আমার থাকার বন্দোবস্ত অনেক স্থানেই করা হয়েছিল অবশ্য সেজন্য আমাকে ভাড়া দিতে হত। কথা হল সহরে পৌঁছে হোটেল খুঁজে বের করা আর এক কাঠিন্য হতে রেহাই পাবার জন্য আনাম যুবসম্প্রদায়কে আমি আবেদন জানিয়েছিলাম। তারাই আমাকে কতকগুলি হোটেলের নাম দিয়েছিল যেখানে গিয়ে থাকতাম এবং আনন্দ পেতাম। আনন্দ কিরূপ পেতাম তারই কথা বলছি—

আমাদের দেশে তরুণ সংঘের লোক মরা পোড়ায়, রোগীর শুশ্রূষা করে, চাঁদা উঠায়। হাতের লেখা মাসিক বের করে, সরস্বতী পুজা করে, তিলক ধারণ করে ও সংবাদ পত্রে নাম যাতে উঠে তার ব্যবস্থা করে। সভাপতি কে হলে কাজটা করে বেশ নাম কেনা যায় তার জন্য মগজ খরচ করে। আনামদের যুবসংঘে শরীর গঠনেরও ব্যবস্থা ছিল না। অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করাও তারা পছন্দ করত না তবে তারা কি করে এই হল জিজ্ঞাস্য ? তারা ভাবত—অমুক, অমুক ত গিলটিনে গেল। এখন গিলটিনে যাবার কার পালা। কাজ করতে হবেই এবং গিলটিনে যেতে হবেই, এই যে সমস্যা বড় কম সমস্যা নয়? গিলটিনে যাওয়া, সরস্বতী পুজো অথবা সাহিত্য চর্চ্চা নয়।

যারা কর্মী তারা যে সকল হোটেলে এসে মেলামেশা করত সেই হোটেলগুলিরই নাম দেওয়া হয়েছিল। আমি যখন সেই হোটেল গুলিতে যেতাম তখন তাদের মুখে নূতন ভাবের চাঞ্চল্য এসে দেখা দিত। তারা আমাকে পর ভাবত না। যদিও অনেকেই কথা বলতে পারত না তবুও সকলেই আমাকে আপন ভেবে যাতে আমি অনেক দিন থাকি সেজন্য অনুরোধ করত। বেশী দিন থাকলে ভাল খাবার এনে দেবে বলে আমায় লোভ দেখাত, অনেকে সাইকেল পরিষ্কার করে দিত। সাইগনের কোনও এক ভিয়েতনামী পত্রিকা আমার নামে বেশ বদনাম রটনা করেছিল, পত্রিকাতে একটা কার্টুনও বেরিয়েছিল। কার্টুনে ছিল যে

দেশের লোক দিনে মাত্র ছয় পয়সা খায় সেই দেশের পর্যটকের দৈনিক ছয় পেসো (নয় টাকায়) কুলোয় না। সেইজন্যেই বোধ হয় আনাম যুবসম্প্রদায় আমাকে খাদ্যের লোভ দেখাত।

পরিশ্রম বেশ হয়েছিল। হোটেলে পৌছেই বিছানাতে শুতে বাধ্য হয়েছিলাম। এদিকে আমার আসার সংবাদ শুনেই হোটেলের লোক-সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করল। আমার পাশের দুখানা ঘর ভাড়া হয়ে গেল। যারা আমার পাশে ঘর ভাড়া করেছিল তারা প্রায়ই উঁকি দিয়ে দেখত আমি কি করছি। আমি কিন্তু কারো সংগে কথাও বললাম না। পথে এত পরিশ্রম হয়েছিল যে রেঁস্তোরায় খাবার খেয়েই শুয়ে ছিলাম।

পরের দিন একাই একটী গ্রামে যাই। গ্রাম দেখবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। পথে শুনেছিলাম ফান্থিয়েটের কাছে কয়েকটি মালয় গ্রাম আছে। গ্রামবাসী আনামদের সংগে শত শত বৎসর ধরে নন্-কো-অপারেশন্ করে আসছে। এরা কি ভাবে আনামিতদের সংগে কোনরূপ সংস্রব না রেখে বসবাস করছে তাই দেখতে হবে।

মালয় গ্রাম মালয় কৃষ্টি বজায় রাখতে সক্ষম হয় নাই। তাদের অজ্ঞাতে গ্রামের গঠন পরিবর্ত্তন হয়েছিল। মালয়রা সাধারণত মাচার উপর ঘর করে। এখানে তা নাই। প্রত্যেকটি ঘরেতে মাটীর ভিত রয়েছে। প্রত্যেকটি ঘর ইতস্ততভাবে অবস্থিত নয়। গ্রামের ঘর সারি বাঁধা। মালয়দের লুংগি এবং বাজু (পান্জাবী ধরণের কামিজ) লোপ পেয়েছে, সে স্থান দখল করল আনামিত ধরণের কোট। ভাষায়ও পরিবর্তন এসেছে। পর্তুগীজ, চীনা এবং জাপানী শব্দের বাহুল্য হয়েছে। আরবী শব্দের লোপ হতে বসেছে। মাছ ধরাটা এখনও রয়ে গেছে। স্ত্রীলোকগণ অনেকেই রং বদলিয়েছে পুরুষদের মধ্যেও শরীরের রং এবং গঠনের পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। গ্রাম দেখে মনে হল এরা বেশী দিন এদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারবে না।

নিরক্ষরতা দূর হওয়ার সংগে সংগেই মালয়রা যেন ফরাসী সভ্যতার দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছে। হয়ত বলবেন ফরাসী সভ্যতাতে ঝুঁকে মালয়দের পক্ষে মহা অপকর্ম্ম হচ্ছে। হয়ত সেজন্য বুক চাপড়াবেন। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলছি কাল যা সভ্যতা ছিল আজ তা অসভ্যতা বলে অনেকে পূর্ব্ব সভ্যতাকে অবজ্ঞা করে। সভ্যতা পরিবর্তনশীল অতএব তা নিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আর লাভ কি?

মালয় গ্রামে দেখবার মত আর কিছুই না পেয়ে আসবার সময় ভিয়েতনামী কয়েকটি গ্রাম দেখে চলে এলাম। গ্রামকে জানতে হলে গ্রামে কিছুদিন থাকতে হয় এবং গ্রামের সংগে পরিচয় করতে হয়। আমার কিন্তু সে সুযোগ হয় নাই। সুখের বিষয় চীনাদের অনুকরণে এ দেশেও শিক্ষিত যুবক যুবতীরা গ্রামে থেকে গ্রামের উন্নতি সাধনে যত্নবান হচ্ছে। আমাদের দেশে কর্মীদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এসে দাঁড়ায় ধর্ম্মের গোড়ামী। উপরন্তু দুটি ধর্ম্মের প্রাধান্য গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ভিয়েতনামীদের সেরূপ কোন প্রতিবন্ধক পূর্বেও ছিল না, এখনও নেই। ছুঁৎমার্গ এ সবের বালাই শুধু আমাদের দেশেই দেখতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোথাও সে বালাই নেই। ভিয়েতনামীদের সামনে একটি মাত্র বালাই ছিল সেই বালাই হল গ্রাম্য পেন্‌শন্ ভোগী সৈন্য বিভাগের লোক। আর বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।

গ্রাম্য পেনশন্ ভোগীরা শুধু পেনশন পেতনা, তাদের নানারূপ তকমা উপাধি এবং সামান্য জমিও দেওয়া হত। এই সামান্য লোভের বশবর্তী হয়ে এই নরাধমরা অনেক নিরপরাধ ছেলে এবং মেয়েকে গিলটিনে পাঠাত। এরূপ নরপশুর সংগে যখন গ্রামে দেখা হত তখন তাদের তকমা গুলি দেখে বেশ প্রশংসা করতাম এবং মনে মনে ওদের সর্বনাশ কামনা করতাম। যখন এই নরপশুদের দেখতাম তখনই আমাদের দেশের খেতাবধারীদের কথা মনে হত না, মনে হত মধ্যবিত্তশ্রেণীর

লোকের কথা। এদের সামান্য ভূসম্পত্তি আছে, সমাজে প্রতিপত্তি আছে, এসব ছেড়ে কি এরা সাধারণ মানুষের উপকার চাইবে? খুব সম্ভব নয়! কিন্তু আরও গভীর ভাবে যখন ভাবতাম তখনই মনে হত ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সুশীল সেন এদের কথা। মনটা অনবরত যেন ধুলিয়ে যেত। কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। যখনই মনের এরূপ অবস্থা হত তখন হয় ঘুমিয়ে থাকতাম নয় কোনও জলাশয়ের কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। তখনও চীনের মাওসুতন শ্রেণীর লোকের সংগে আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই, তখনও আমি অন্ধকারেই অনেক জিনিষ স্পর্শ করতাম কিন্তু অনুভব করতে পারতাম না। জিনিসটার স্বরূপ কি হবে!

ফান্‌থিয়েট বড় শহর নয়, একদিনের বেশী এখানে থাকতে মন কিছুতেই মানছি না। যদিও স্থানীয় ভারতবাসী এবং আনামীতরা খাবারের সুবন্দোবস্তই করেছিল। আনামীতরা জংলী হাঁসের তরকারী তাদের নিয়মানুযায়ীই তৈরী করে বিকালে পাঠিয়ে দিয়েছিল। খাবার এবং অর্থের অভাব ছিল না। তবুও আমার মন এসব পরিত্যাগ করে সামনের দিকেই এগিয়ে চলত। এই প্রবৃত্তিটুকু যদি না থাকত তবে আমাকেও বসে খেতে হত।

অনেক পর্যটক দেখেছি যারা সামান্য ভ্রমণেই বসে যায় এবং বই লিখতে আরম্ভ করে ও ভ্রমণে তাদের অনিচ্ছা আপনি বৃদ্ধি পায়। তার কয়েকটি কারণই আছে। শরীরের দুর্বলতা, "হোম-সিক" এবং সাধারণ লোকের সংগে মেলামেশার অপ্রবৃত্তি। ভ্রমণে অপ্রবৃত্তির আরও নানা কারণ থাকতে পারে, আমার কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোন অভিজ্ঞতা নাই। ভ্রমণের সময় অনেকগুলি পর্যটক দেখেছি যাদের শরীরের দুর্বলতার সংগে মনের দুর্বলতা বেশ প্রকাশ পেয়েছিল এবং তারা ভ্রমণ হতে নিবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছিল।

সুখ এবং দুঃখ

ফানথিয়েট থেকে নাত্রাং পর্যন্ত যেতে পাঁচ দিন লেগেছিল। এই পাঁচদিনের মধ্যে কোথাও এক দিন থাকতে ইচ্ছা হয় নাই, যদিও সর্বত্র আদর যত্নের অভাব হয় নি। এদিকে তাড়াতাড়ি চলবার আরও একটি কারণ ছিল। প্রত্যেক শহরে পৌঁছামাত্র পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যেত এবং পাসপোর্টে আসা যাওয়ার তারিখ লিখে দিত। হিসাব করে দেখলাম এরা যদি এমনি ভাবে লিখতে থাকে তবে আমার পাসপোর্টের পাতা কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। সেজন্য শহরে না থেকে গ্রামেই থাকতাম। গ্রামের লোক আদর যত্ন করত।

নাত্রাং পৌঁছার পূর্বে একদিন রেল লাইনের পাশ দিয়ে চলছিলাম। রেলের যাত্রীরা আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দসূচক ধ্বনি করছিল। যারা আমার দিকে তাকিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিল তারা সবাই ছিল চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রী। অনেকে ভাববেন চতুর্থ শ্রেণী আবার কি? আমাদের দেশেও রেলে চতুর্থ শ্রেণী আছে, তবে সেটা আমরা স্বীকার করি না। প্রথম, দ্বিতীয় তারপরে আসে মধ্যম অর্থাৎ ইন্‌টার ক্লাস। ফরাসীরা বাস্তববাদী সেজন্য তারা ইন্‌টার ক্লাস না বলে ইন্‌টার ক্লাসকে তৃতীয় শ্রেণী বলে। যাকে আমরা তৃতীয় শ্রেণী বা থার্ডক্লাস বলি ফরাসীরা তাকে বলে চতুর্থ শ্রেণী। চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রীর অবস্থা আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর মতই। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী এবং ধনী ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতে সক্ষম হন। ফরাসীদের মধ্যে যারা নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর লোক তারাই তৃতীয়

শ্রেণীতে চলাফেরা করে। সাধারণতঃ ভিয়েতনামীদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় সেজন্য উপরের ক্লাসে ভ্রমণ করতে পারে না চতুর্থ শ্রেণীরই আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।' আনামদের মধ্যে যারা চতুর্থ শ্রেণীতেও ভ্রমণ করতে সক্ষম হয় তাদের যদি সুখী বলা হয় তবে অন্যায় হবে না। যে দেশে ভূমির মালিক বিদেশী, যে দেশের লোক দৈনিক দুবার পেট ভরে খেতে পারলে ভাবে খুব খেয়েছে, যে দেশে ঔষধ এবং হস্‌পিটাল নাই বললেই চলে সে দেশে যদি কেউ চতুর্থ শ্রেণীতে বসতে পারে তবে তাকে সুখী ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না।

ফানথিয়েট হতে নাত্রাং চলার পথে অনেক স্ত্রী মজুরদের সংগে দেখা হয়। চার মাইল হেটে গিয়ে অনেক স্ত্রী মজুর ফরাসীদের জমিতে কাজ করে আবার সেদিনই ফিরে আসতে সক্ষম হয়। এরূপ কঠিন কাজ তাদের পক্ষে বেশী দিন করা সম্ভবপর হয় না। সেজন্য স্ত্রী মজুরদের মধ্যে ক্ষয়রোগ লেগেই থাকে। আনামরা কিন্তু ক্ষয় রোগীর বেশী যত্ন নেয় না। তারা ভাবে ক্ষয়রোগী যত শীঘ্র মরে যায় ততই ভাল। ঔষধ, খাদ্য এবং বস্ত্রের যেখানে ব্যবস্থা নাই সেখানে বেশিদিন কষ্ট ভোগ করে মরার চেয়ে তাড়াতাড়ি মরাই সমাজের পক্ষে উপকারী। এরূপ চিন্তাধারা কিন্তু আমাদের দেশেও আছে। আমরা ভাবি যত শীঘ্র মৃত্যু হয় তত শীঘ্রই স্বর্গে অথবা নরকে গিয়ে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে পারব, আনামরা সেরূপ কিছুই ভাবে না কারণ বুদ্ধদেব পরজন্ম বলে কিছুই বলে যান নাই।

যে দিন আমি নাত্রাং পৌছি সেদিন বিকাল বেলা Khanh Hoa খান্ হোয়া নামে একটি ছোট্ট সহরে পৌছি। একেত পরিশ্রান্ত তার উপর সহরে পৌছামাত্র একটা লোক আমার পেছন নেয়। খাবারের দোকানে বসামাত্রই লোকটা পুলিশ অপিসে যেতে বলে। আমি তার মতলব বুঝেই তাড়াতাড়ি করে খাবার শেষ করিএবং সহরের বাইরে এসে

মস্ত বড় একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে থাকি। ইত্যবসরে লোকটা আমার পেছন পেছন এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করতে থাকে আমি শহরে থাকব কিনা। তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটি আনামিতের কাছ থেকে চারটি কমলা কিনে তাই খেতে মন দেই। লোকটা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে অবশেষে চলে যায়। যাবার পূর্বে সে ভ্রূকুটি করে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তার চাহনি এবং চালচলন দেখে মনে হয়েছিল সে নিশ্চয়ই কোন পেন্সন-নিয়ারের ছেলে।

থান্ হোয়া থেকে নাত্রাং মাত্র দুই কিলোমিটার। এই দুই কিলো-মিটার পথের মধ্যে ফরাসীরা নানারূপ দুর্যোগের সৃষ্টি করে রেখেছে। যে কোনও আনাম দক্ষিণ হতে উত্তরে যেতে চায় তাকে নানারূপ পরীক্ষা করার পর ছাড়া হয়, কোনও "কারবারী" অর্থাৎ যারা ফরাসীদের উৎখাত্ করতে চায় তারা কিন্তু ভুলেও এ পথে নাত্রাং যায় না। তারা পদব্রজে অনেক দূর দিয়ে পার্বত্য পথ ধরে নাত্রাং পৌঁছে। এক স্থানে দাঁড়িয়ে দেখলাম অনেকগুলি লোক তাদের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ফ্রেনচম্যাণ এসে প্রত্যেকের পাশ দেখে চলে গেল। সে দেখল শুধু তাদের পরিচয় পত্র; অবিকল আমাদের দেশের Postal Identification Card এর মত। অনেকে হয়ত "পোষ্টেল আইডিন্টি-ফিকেসন" কি জিনিষ জানেও না। জানবার দরকারও নাই। ভবিষ্যতে হয়ত দরকার হবে। কিন্তু ইন্দোচীনের বয়স্ক পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের সকলকেই সেরূপ একটি পরিচয়পত্র রাখতে হয়। তা আবার বৎসরে বৎসরে বদলাতে হয়। এতে ফটোর খরচ ও পরিচয় পত্র নূতন করার ফি দিতে হয়। প্রত্যেক বৎসর পরিচয় পত্র নূতন করবার জন্য ইন্দোচীনের লোকের অনেক খরচ করতে হয়। আমাদের দেশে যদি সেরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হয় তবে ভারত সরকারের কমের পক্ষে এক

শত কোটি টাকা আয় হবে। কিন্তু আমরা কি তা হতে দেব? নিশ্চয়ই না। পৃথিবীর কোথাও সেরূপ নিয়ম নাই, আছে শুধু ফরাসীদের কলনীতে। বর্তমানের ভিয়েতনামীরা নিশ্চয়ই সে অনিয়ম উঠিয়ে দিয়ে তাদের নিজের বন্ধনের একটি গ্রন্থি খুলে দিতে সক্ষম হবেই।

নাত্রাং ছোট্ট শহর। শহরে পৌঁছেই পাসপোর্ট দেখবার জন্য পুলিশ অফিসারের অপিসে গেলাম। পাসপোর্ট অফিসার তখন টাকা গণছিল। আমাকে দেখামাত্র সে টাকা গণা বন্ধ করে রেখে পাসপোর্ট দস্তখত দিয়ে বিদায় করে দিল। আমিও নিশ্চিন্ত মনে একটি হোটেলে এসে নিকটস্থ ভারতীয় ব্যবসায়ীর কাছে তাঁরই বাড়ীতে রাত্রে খাব জানিয়ে হোটেলে এসে বিশ্রাম করছিলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই একজন তামিল মুসলমান এসে বলল "খবরদার এখানকার যুবকদের সংগে কথা বলবেন না, এরা হল ফরাসীদের একান্ত ভৃত্যদের ছেলে। এরা চায় না ফরাসীরা এদেশ ত্যাগ করুক। এরা চায় ফরাসীরা এদেশে থেকে দরিদ্রদের প্রতি অত্যাচার করুক এবং তাদের সামান্য কিছু দিক। এরা কিন্তু আপনার কাছে আসবে, খবরদার কিছু বলবেন না। সামান্য দু-এক কথা বলেই লোকটি চলে গেল। সংগের হোটেল-লিষ্টখানা খুলে দেখলাম নাত্রাং শহরের কোন হোটেলের নাম নাই। এর মানেই হল যে সকল যুবক গিলটিনে যায় তাদের এখানে কোন আড্ডা নাই। হোটেলের লিষ্টখানা যত্নের সহিত রেখে দিয়ে স্নান করলাম তারপর তামিল মুসলমানের বাড়ীতে খেয়ে যখন হোটেলে আসলাম তখন কতকগুলি লোককে দেখতে পেলাম। মঁশিয়ে পারেয়ারী একদিন গল্পচ্ছলে এদের কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আপনাদের ধারণা ফরাসী জাতটা বড়ই বিলাসী এবং বিলাসের সংগে তার যত উপসর্গ থাকা চাই তাদের মধ্যে রয়েছে, কথাটি তাদের কলনীতেই প্রযোজ্য। ফরাসী কলনিয়েল দেশগুলিতে

যতরূপ পাপের পদ্ধতি দেখা যায় ফরাসী দেশে তার শতাংসের এক অংশ ও দেখা যায় না।

আগত যুবকগণ সকলেই বিলাসী। বিলাসের যত রকম পদ্ধতি আছে এদের সবই জানা ছিল। প্রথমত এরা এমন কতকগুলি প্রশ্ন করল যা কোন সভ্যদেশের লোক অন্য কোন সভ্যদেশের লোককে জিজ্ঞাসা করে না। এদের প্রশ্ন শুনে আমার যেন জ্ঞান লোপ পেয়েছিল, কিন্তু এদেরই দেওয়া একটু ভিনো খেয়ে মনটাকে একটু তাজা করে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। ক্রমেই আমার রাগ বাড়ছিল। আমার যখন রাগ হয় তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। হঠাৎ মুখ থেকে বের হয়ে গেল "বের হয়ে যাও।" গাধাগুলি বুঝল এখানে আর বসা উচিত নয় তাই হোটেল পরিত্যাগ করে চলে গেল। ভিনোর বোতলটা নিতে ভুলে গিয়েছিল। রাগ করে বোতলটা দোতলার উপর থেকে নর্দ্দমাতে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকলাম।

নাত্রাং, সংচু, কুইনন্, বংসং, কোয়াংনেগ, তম্‌কে প্রভৃতি স্থানে এক রাত করে থেকেছিলাম। তম্‌কে হতে যে দিন তোরেণ্ (Tourane) নামক স্থানে যাই সেদিন আমাকে এক অপ্রত্যাশিত বিপদের সংগে লড়াই করে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল। তম্‌কে নামক স্থান হতে পথ একত্রই এবং শুধু চড়াই। প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়েছিল। পথে খাদ্য ছিল না। এক স্থানে জেলেদের রক্ষিত ভাত চুরি করে খেয়েছিলাম, তাতেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই। সংগের জল শেষ হয়েছিল। ডানদিকে বিশাল সমুদ্র ছিল। সমুদ্র দেখে জল পিপাসা আরও বেড়ে যেত। ভ্রমণের প্রবৃত্তি অনেক সময় লোপ পেত। অতি কষ্ট করে যখন পাহাড়ের উপরে উঠলাম তখন উত্তর থেকে একটা বেশ ঠাণ্ডা বাতাস আসছে অনুভব করলাম। ঠাণ্ডা বাতাসে দাঁড়িয়ে দুর্ব্বল শরীরকে একটু সবল করে চুদিকের দৃশ্য দেখতে

ছিলাম। একদিকে বিশাল অনন্ত সমুদ্র আর অন্যদিকে মালভূমির উপর বড় বড় পাহাড় আকাশের দিকে আগিয়ে চলেছে।

এরূপ সুন্দর দৃশ্য এই পৃথিবীতে কমই দেখা যায়। যখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছিলাম তখন হঠাৎ পেছন দিকে দেখি একটি যুবতী দাঁড়িয়ে হাসছে। যুবতীর হাসি পর্যটকের বিপদ টেনে আনে। আমি কিন্তু যুবতীকে কোনরূপ প্রশ্রয় দিলাম না। আমার কাছে কোনরূপ প্রশ্রয় না পেয়ে জংগলের অন্তরালে অন্তর্হীত হল, আমিও শান্তি পেলাম। পাশেই পথিকের বিশ্রামার্থ একটি ঘর। ঘরটাতে প্রবেশ করে বাঁশের মাচার উপর শুয়ে থাকলাম। ঘুম চোখ দুটাকে বুজিয়ে দিল। হঠাৎ মনে হল কতকগুলি লোক আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম ভাংগার সংগে সংগেই দেখলাম কয়েকটি লোক অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষণবিলম্ব না করে সাইকেলে গিয়ে চড়লাম্ এবং পেছনের দিকে না তাকিয়ে উৎরাই এর দিকে সাইকেল ছেড়ে দিলাম। জংলী লোকগুলি তাদের শিকার পালায় দেখে হাতের বল্লম আমার দিকে ছুড়ে মারল, কিন্তু এই আঁকা বাঁকা পথের উপর থেকে বল্লম ছাড়লে কোনও ফল হবে না তা আমি জানতাম। ঘণ্টা দেড়েক উৎরাই চলে যখন কোয়েং নাম নামক ছোট গ্রামে পৌছলাম তখন আর চলবার ক্ষমতা ছিল না। একটা বাজারের মধ্যে গিয়ে সবজি বিক্রেতাদের পরিত্যক্ত ষ্টলে শুয়ে থাকলাম। ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পূর্বে নদী পার হয়ে তোরেন্ নামক শহরে পৌছলাম।

তোরেন্ বড়ই সুন্দর শহর। এখান থেকেই প্রকৃত পক্ষে উত্তর ভিয়েতনাম আরম্ভ হয়েছে। এখান থেকেই জলবায়ুর একেবারে পরিবর্তন অনুভব হয়। আকাশ পরিস্কার থাকে। বৃষ্টি হয়ে যাবার পরই মনে হয় যেন বৃষ্টি হয় নাই, আকাশে একটুও মেঘমালা জমে থাকে না। ট্রপিকেল দেশগুলিতে যে সকল বৃক্ষরাজি দেখতে পাওয়া যায়

এখানে তার নামগন্ধও নাই। রাত্রে বেশ একটু শীত অনুভব হয় কিন্তু লেপের দরকার হয় না। তোরেন্ স্থানটি যদিও সুন্দর, জলবায়ু যদিও ভাল কিন্তু এখানেও কয়েক দিন বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হল না। যে কয়জন ভারতবাসী পেলাম তারা নেহাৎই ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় কথা আমি ভিয়েতনামী যুবসমাজের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম। এসব স্থানে তাদের দলের একজন লোকও না পাওয়ায় কোন স্থানে রাত কাটান ছাড়া আর বিশ্রামার্থ একদিনও থাকতে ইচ্ছা হয় নাই।

উত্তর ভিয়েতনাম

উত্তর ভিয়েতনামের অপর নাম তংকিন্। তংকিন্ পার্বত্য প্রদেশ। এখানকার লোকগুলি চীনাদের মতই বাড়ীঘর তৈরী করে বটে কিন্তু তাদের ঘরের সামনার দিক দেখলে মনে হয় চীনাদের স্থপতি বিদ্যার সংগে উত্তর তংকিনের স্থপতি বিদ্যার কোন সম্পর্ক নাই। তংকিন যখন চীনাদের অধীনে ছিল তখন প্রাদেশিকতা ছিল না। আনামদের প্রতি চীনাদের অবহেলা অথবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই তার এক মাত্র কারণ। চীনাদের মধ্যে যারা এখনও চিয়াংকাইসেককে জননায়ক এবং ভাল-মানুষ বলে মেনে চলে তারা আনামদের ভাল চোখে দেখে না এমন কি আনামরা স্বাধীন হউক তাও অনেকেই পছন্দ করে না। চীনাদের মতে আনাম বর্ণসংকর এবং নিকৃষ্ট স্তরের লোক। কোমিংটানের দলভুক্ত লোকগুলি এখনও সেরূপ মতই পোষণ করে। যাদের প্রতি আবহমান কাল হতে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে তারা কখনও চীনাদের স্থপতিবিদ্যা গ্রহণ করতে পারে না, সেজন্য বোধহয় উত্তর ভিয়েতনামের লোক চীনাদের কাছে থেকেও ভারতীয় স্থপতিবিদ্যা সমাদরে গ্রহণ করেছিল এবং এখনও তারা ভারতীয় স্থপতি বিদ্যার পক্ষপাতী।

উত্তর ভিয়েতনামে প্রবেশ করা মাত্রই বুঝতে পারা যায় চীনাদের সংগে উত্তর ভিয়েতনামীদের কত পার্থক্য রয়েছে। প্রকাশ্যেই চীনারা আনামদের ঘৃণা করে। কিন্তু হঠাৎ মধ্য চীন হতে একদল যুবক-যুবতী এক নূতন চিন্তাধারা নিয়ে তংকিনে আসেন। সেই চিন্তাধারা চীনা এবং উত্তর ভিয়েতনামীদের একত্রিভূত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই

নূতন চিন্তাধারা তংকিনে প্রচারিত হবার পূর্বে বড় বড় নদী তীর ধরে গুন টেনে চীনা এবং আনাম মাঝিরা যখন চলত তখন একের দুঃখে অন্তে দরদী হত না। আনাম ভাবত চীনা মরেছে তাতে তাদের কি হয়েছে, আনাম মরলে চীনারাও সেইরূপ ভাবত। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনামের প্রগতিশীলরা সেই দুষ্টভাব দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। চীনা এবং আনাম মাঝিরা বুঝতে পেরেছিল, তারা মাঝিই চীনাও নয় আনামও নয়। যে দিন সেই চিন্তাধারা আনাম এবং চীনাদের মধ্যে প্রাধান্য অর্জ্জন করে সে দিন থেকে উত্তর ভিয়েতনামীদের প্রতি ফরাসীদের অত্যাচার বেড়ে যায় এবং চীনা মাঝিরা নীরবে কমিংটাং অফিসারদের দ্বারা কমিউনিষ্ট আখ্যা পেয়ে নিধন হতে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ থেকেই উত্তর ভিয়েতনাম বধ্য-ভূমিতে পরিণত হয়ে ছিল।

১৯২৬ সালে উত্তর ভিয়েতনামে চীনা এবং আনামদের মধ্যে প্রগতিশীলরাই ভাতৃভাব স্থাপন করে এবং যারা এই সম্বন্ধ স্থাপন করে-ছিলেন তাদের মধ্যে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেউ বেঁচে ছিলেন না। কেউ গিলটিনে গলা কাটাতে বাধ্য হল, কেউ পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে বন্য জীবের দ্বারা নিহত হন। কিন্তু তারা যে চিন্তাধারা প্রচার করে গিয়েছিলেন তা পত্র-পুষ্পে শোভিত হতে ছিল। সেই চিন্তাধারাকে দমন করার জন্য চিয়াংকাইসেকের চেলা চেন্‌চাইথং চীনাদের হত্যার ব্যবস্থা করছিল এবং অন্যদিকে ফরাসী সম্রাজ্যবাদীরা আনামিতদের সর্ব্বনাশ করতে ছিল। এরূপ ধ্বংস লীলা আমি দেখতে পাইনি বটে কিন্তু কর্মীরা যখন আমার কাছে এক নিশ্বাসে তাদের কষ্টের কথা বলতেন তখন কিছুই অবিশ্বাস করতে পারতাম না।

হুয়েতে পৌছার পরই বুঝতে পারলাম এবার সজীব কর্ম্মক্ষেত্রে এসেছি। হুয়ে আনাম সম্রাটের রাজধানী। শহরটি বেশ বড় এবং

পিকিন্ শহরের সংগে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। পথগুলি প্রশস্থ এবং পাশের বাড়ীগুলি একতলা। শহরের সর্বত্র নির্জিবতা বিরাজমান। এরূপ নির্জিব পথে চলতে ভাল লাগছিল না। অবশেষে একটি হোটেলে পৌছি। হোটেলে প্রাণ ছিল। হোটেলের পাশেই একটি বাগানে সবুজ বৃক্ষগুলি স্নিগ্ধ বাতাসে বেশ নড়ছিল এবং হোটেলবাসীর প্রাণে প্রাণ এনে দিচ্ছিল।

হোটেলে পৌছেই দেখলাম অদূরে সম্রাটের প্রাসাদ। প্রাসাদ সমতল ভূমিতেই অবস্থিত। আপনা হতেই দৃষ্টি সেদিকে যায়। সাগরতীর পর্যন্ত সম্রাটের বাড়িগুলি চলে গেছে। বড় বড় পথগুলি শহরের বক্ষস্থল ভেদ করে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে। পথের উপর বালি কাঁকড় এমন কি বড় বড় পাথর পর্যন্ত পড়ে রয়েছে। সেজন্যই শহরকে সুন্দর বলা চলে না।

সমুদ্রতীরে এক পাশে ছোট্ট বাংলো ধরণের বাড়ি, সেখানেই সম্রাট থাকেন। লোকে বলে সম্রাট সাম্রাজ্য চান না। ফরাসীরা জোর করে সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছে। সেজন্য বোধ হয় সম্রাটকে কয়েদী জীবন কাটাতে হয়। বর্ত্তমানে সম্রাট সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করেছেন। ভিয়েতনামীরা যেমন সম্রাটকে ঘৃণা করে, সম্রাটও তেমনি সাম্রাজ্যবাদ ঘৃণা করেন।

হোটেলের অবস্থিতি দেখে মনে হল, আমি গরীব পাড়ার একটি হোটেলে স্থান নিয়েছি। হোটেলে চারদিকে ছোট ছোট ঘর। ঘর-গুলিতে দরিদ্র লোক বাস করে। দোতলা হতে দরিদ্রের কাজকর্ম বেশ দেখা যায়। আমি কিন্তু দরিদ্রের কাজকর্ম দেখা পছন্দ করলাম না। ভারতীয় সেপাইরা এরূপ হোটেলে এসেই যুবতীদের অন্বেষণ করে। সেজন্য সামনের বড় পথটার দিকেই চেয়ে থাকা ভাল মনে করলাম।

কতক্ষণ পর দেখলাম একজন চীনা ভদ্রলোক দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। তিনি আর কেউ নন্ আমার পূর্ব পরিচিত চীনা পোষাকে আবৃত মঁশিয়ে নাংতে। তাঁর পোষাকে দেখে মনে হচ্ছিল, অবিকল একটি চীনা লোক। সর্বপ্রথম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে দুজন লোক রুশিয়ায় যাবে ঠিক হয়েছিল তারা কি চলে গিয়েছে? মঁশিয়ে নাংতে বললেন "তাঁরা এখন বোধ হয় ইউনান্‌ফোতে পৌছে গেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। এঁরা কেউ আপনার সংগে দেখা করে যেতে পারেন নাই বলে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেছে। সোভিয়েট রুশিয়া দেখেই তারা দেশে ফিরে আসবেন। একটি সুখের সংবাদ আপনাকে জানাচ্ছি। উভয় ভদ্রলোকই আপনার ছবি সোভিয়েট রুশিয়াতে নিয়ে যাবেন এবং আপনারই সাহায্যে তাঁরা যে সোভিয়েট রুশিয়া পৌছতে সক্ষম হয়েছেন, সে কথা তাদের বন্ধুদের বলতে ভুলবেন না।

মঁশিয়ে নাংতে আমার জন্য জংলী হাঁসের তরকারী পাক করে এনেছিলেন। আমাকে স্নান করে আসতে বললেন। তার কথা মতে স্নান করে উভয়ে জংলী হাঁসের তরকারী এবং ভাত খেয়ে নিলাম। খাবার পর মঁশিয়ে নাংতে আমার কাছ হতে বিদায় চাইলেন। দুঃখের সহিত তাঁকে বিদায় দিতে হল।

সকাল হতেই পুলিশ এসে হাজির হল এবং গতকল্য কেন পুলিশ ষ্টেশনে যাই নাই তার কৈফিয়ৎ চাইল। কৈফিয়ৎ তলব শুনে বড়ই রাগ হল, কিছু না বলে সাইকেল নিয়ে বের হলাম এবং একেবারে পুলিশ ষ্টেশনে গিয়ে বড় কর্ত্তার সংগে দেখা করলাম। তিনি তখন আরামে খাবার খাচ্ছিলেন। আমাকে দেখা মাত্রই "আলে আলে" বলে চিৎকার করে উঠলেন। আমিও সমতালে ইংলিশে বললাম "আলে আলে" কেন মশিয়ে, পাকৃতি পাকৃতি বললে কি হয় না? গতকল্য বিকালে এখানে

এসেছি, বিকালেই কেন আসি নাই তার জন্য আপনার লোক কৈফিয়ৎ চেয়েছে, এই নিন পাশপোর্ট। পাশপোর্টটা অফিসার হাতে নিয়ে পকেট থেকে অতিকষ্টে কলমটা বের করে একটা দস্তখত করে আমার হাতে দিয়ে বললেন "পাকৃতি" মানে "দূর হও"। আমিও "ঐ মঁশিয়ে পাকৃতি" বলে চলে এলাম। এতটুকু বলবার সাহস ছিল কারণ এটা ভাল করেই জানতাম্ আমাকে গিলটিনে পাঠানো হবে না, থার্ড ডিগ্রি দেওয়া হবে না। আমাকে শাস্তি দেবার মত যা কিছু ছিল, তা হল দেশ হতে বের করে দেওয়া।

পুলিশ ষ্টেশন হতে ফিরে আসতে বেশ কষ্ট বোধ হচ্ছিল। পথটাতে বোধ হয় পথের জন্ম হবার পর থেকে আর বালি পাথর দেওয়া হয় নি। সেজন্য পথের সর্বত্র উল্টোমুখি পাথরগুলি আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছিল। পাথরের উপর যখন সাইকেলের চাকাগুলি ধাক্কা খেতেছিল তখন পায়ে নয়, অথবা মাথায়ও নয়, একদম বুকে আর পিঠে ব্যথা লাগত। দেড়মাইল পথ অতিক্রম করে হোটেলে এসে দেখি মঁশিয়ে নাং বাইরে দাঁড়িয়ে আমারই মত শহরের দৃশ্য দেখছেন। কিছু না বলে দরজা খুলে মঁশিয়ে নাংকে, বললাম; কিছুটা গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারেন, স্নান করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাই হবে বলে মঁশিয়ে চলে গেলেন এবং ঘণ্টা খানেকের পর আমাকে ডেকে স্নানাগারে দিয়ে গেলেন। স্নান করে একটি এস্‌পিরিনের বড়ি এবং এক কাপ কাপি খেয়ে শুয়ে থাকলাম। কতক্ষণের মধ্যেই শরীরে ঘাম দিল এবং শরীরটা তাজা হয়ে উঠল। তবুও বিছানা ত্যাগ করলাম না। দ্বিপ্রহরে পরেজ খেয়ে কাটালাম। বিকালের দিকে একটি স্ত্রীলোক ভাত এবং সিদ্ধ সবজি নিয়ে এল। যুবতীর যৌবনে শরীর যেন লেপে রয়েছিল! তার চোখ দুটা যেন জ্বলছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ছোট ভাইটি তার কয়লার খনিতে কাজ করত। মজুরী সকলের জন্য

বেশি চেয়েছিল বলে গিলটিনে গেছে। যার ভাই গিলটিনে যায় তার যৌবন কোন দিকে আসে আর কোন দিকে যায় সে খবর যুবতী রাখে না। যুবতীর দিকে আর চাইতে ইচ্ছা হল না। তার দেওয়া খাদ্য খেয়ে শুয়ে থাকলাম এবং আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হলাম। বাঃ ঘুম কত আরামের! সকল দুঃখ সকল কষ্ট একেবারে লোপ করে দেয়। নয়টি বৎসর বিদেশে কাটিয়েছি, লক্ষ্য করে দেখেছি কোনও পুলিশ নিদ্রিতব্যক্তিকে জাগায় না। কিন্তু যারা ধর্ম মেনে চলে তারা নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা আমোদ মনে করে।

সন্ধ্যার পূর্বেই ঘুম থেকে উঠলাম। অনেক আত্মীয় স্বজনহারা লোকের সংগে দেখা হল। অনেকে কথা কইল আর অনেকে চুপ করে বসে থাকল। যারা চুপ করে বসে ছিল তাদের চোখ হতে আগুন বের হচ্ছিল। সীমান্তের পাঠানদের যেমন প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি এদেরও ঠিক তেমনি প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রতিশোধ নেবে কোথায় এবং কার বিরুদ্ধে? সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী সকল পথ রোধ করে রেখেছে। ভিয়েতনামীরা পেন্‌সনিয়ারদের ছেলেমেয়েদের বয়কট করেছে, পারলে যমালয়েও পাঠাচ্ছে, কিন্তু ফরাসীদের সংগে পেরে উঠছে না। শুধু তাই নয়, ভিয়েতনামীদের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছে যারা পূর্বের মনোবৃত্তি বজায় রাখতেই উৎসুক। নূতনকে তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়। সুখের কথা হল এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। আনাম রাজ্যে অনেক বিদ্রোহ হওয়ার জন্য লোকে কোনও এক বিষয়ে আকড়িয়ে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। এত যে উন্নত ধরণের সভ্যতা তার মধ্যেও কিন্তু ভিয়েতনামীরা মাথা তুলতে সক্ষম হচ্ছিল না তার একমাত্র কারণ হল ফরাসীদের কড়া হাতের শাসন।

বিকালের দিকে কয়েকজন ভারতবাসীর সংগে দেখা করে পরের দিন সকালে যখন হানয় শহরের দিকে রওয়ানা হয়েছি তখন দেখতে

পেলাম একদল নিগ্রো সেপাই মোটর বাইক নিয়ে উত্তর দিকে চলছে। তাদের চলন এবং কর্ম-তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছিল কাছেই কোথায় লড়াই বা আগুণ লেগেছে, সেই লড়াই বা আগুণ নিবাতে তারা চলেছে। আজকাল সে ধরণের সৈন্যের তৎপরতা আমরা কলিকাতায়ও দেখতে পাই। কলিকাতায় সেপাইরা যায় দাংগা দমন করতে কিন্তু এরা কিসের জন্য গিয়েছিল তাই চিন্তা করে বের করা একটু কষ্টকর ব্যাপার।

হানয় পৌঁছবার পর শুনছিলাম কোনও ফরাসী ফার্মের ভিয়েতনামী মজুররা বেশি মাইনের দাবী করে ধর্মঘট করেছিল। সেই ধর্মঘটের নেতৃত্ব যারা করেছিলেন তাদের যখন প্রকাশ্যস্থলে শাস্তি দেবার বন্দোবস্ত হয় তখন মজুরগণ গিয়ে স্থানীয় পুলিশকে আক্রমণ করে। স্থানীয় পুলিশ নিজকে রক্ষা না করতে পেরে নিকটস্থ সৈন্যের সাহায্য চেয়েছিল। পুলিশ ছিল তিনজন। এই তিনজনকে সাহায্য করার জন্য তিন প্লেটুন সেপাই রওনা হয়েছিল এবং গন্তব্য স্থলে পৌঁছে তারা যা করেছিল তা অবক্তব্য এবং অপ্রকাশ্য। শুনা কথা প্রায়ই সত্যমিথ্যার জড়িত থাকে অতএব এসব বিষয় নিয়ে বেশি বলা কর্ত্তব্য নয়।

মঁশিয়ে নাং বলেছিলেন হানয় না পৌঁছা পর্যন্ত পথে আর কিছুই দেখতে পাব না। এর মানেই হল যতগুলি শহর আসবে তাতে তাদের কার্যকলাপ মোটেই ভাল চলছে না। নিজের দোষ স্বীকার করা বড়ই কঠিন কাজ। নাংকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছিলাম আমি পর্যটক পলিটিক্স আমার পেশা নয়। পথে আরও অনেক কিছু দেখার মত আছে আমি তাই দেখে সুখী হব। অপরে যদি পর্যটককে কিছু না দেখিয়ে দেয় তবে সহজে কিছু দেখাও যায় না। থাকা হয় হোটেলে, চলতে হয় বড় বড় পথে, দেখবই বা কি আর জানবই বা কি? তবুও আনন্দের সহিত পথ ধরে চল্‌লাম। মনকে খুসী করার জন্য গান গাইতাম। আর

যাহাই নূতন দেখলাম তার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে আবার চলতাম এই করেই আমার দিন কাটত। রাত্রে শহরে থাকতে হয় বলেই শহরে থাকতাম নতুবা পথের পাশে শুয়ে থাকতেও কষ্ট হত না। যে শহরেই যেতাম দু'এক জন করে ইণ্ডিয়ান্ পেতাম। তারা আর্থিক সাহায্য করত, অফিসারদের সংগে পরিচয় করে দিত, অফিসারগণ আমাকে প্রকাশ্যে প্রশংসা করত অন্তরে কিন্তু ঘৃণাই করত কারণ তাদের অনেক কিছু বিচিত্র কাহিনী আমার ডাইরীর পাতায় পাতায় দেখতে পেয়ে অনেকেই মাথা নত করত। অনেকে জিজ্ঞাসা করত "এ সব কবে পুস্তকাকারে ছাপা হয়ে বের হবে? বলতাম "যত সত্বর পারি ছাপাব"। তারা যখনই শুনত যত সত্বর পারি ছাপাব তখনই তারা কথা না বাড়িয়ে চলে যেত। তাদের দিকে চেয়ে থেকে আমি শুধু হাসতাম আর ভাবতাম, এরা তাদের অপকর্মকে এতটুকু ভয় করার পরও অপকর্ম করে।

কয়েক দিন ক্রমাগত পথ চলে ভীন্ নামক এক শহরে পৌছি। ভিন্ খুবই ছোট শহর। কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের যে লোক সংখ্যা হবে ভিন্ শহরের লোকসংখ্যা তত হবে বলে অনুমান হল। আসল কথা হল লোকসংখ্যা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। পথে পাগল চলছে, লোক পাগল খেপাচ্ছে, ভিখিরী চলছে, কেহবা দান করছে আর কেহবা সমালোচনা করছে। দরিদ্র এবং উলংগ লোক দেখে লোকে ঘার ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে এ সবই কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে দেখা যায়। কিন্তু আনামের ভিন্ শহরটিতে সন্ধ্যার পর যখন বের হলাম তখন সর্বত্র বিজলীবাতি ঝক্‌মক্ করছিল। একটা নিগ্রো সেপাই প্রস্রাব করতে গিয়ে ফিরে আসবার সময় পেন্টের বোতাম লাগাতে ভুলে গিয়েছিল। সে যখন পথ ধরে চলছিল তখন একজন ফরাসী সেপাই তাকে থামিয়ে পেন্টের বোতামগুলি এটে দিয়েছিল। একজন মাতাল

চিৎকার করে পথে চলছিল। অন্য আর একজন তাকে ধরে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল। একজন বারবণিতা মাতাল হয়ে পথের উপর ছুটাছুটি করছিল। দুজন তাকে ধরে নিয়ে যথাস্থানে পৌছে দিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে ভিন্ শহরটি একটি মাতালের আড্ডা যদি বলা হয় তবে দোষ হবে না। এখানে নানাপ্রকারের মদ তৈরী হয় এবং ইন্দোচীনের সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। এখানে ফরাসী সভ্যতা বেশ ভাল করেই বিকশিত হয়েছে কারন এখানকার অধিবাসী প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত এবং পেন্সানিয়ারদের আড্ডাস্থল। এখানে যেরূপ ব্যভিচার চলে আমার মনে হয় ইন্দোচীনের আর কোথাও তেমন ব্যভিচার চলে না। যেখান বণিকশ্রেণী বাস করে সেখানেই ব্যভিচারের নগ্ন মূর্ত্তি আপনি সজীব হয়ে উঠে।

হানয় এবং হাইফং

হানয় পৌঁছবার পূর্বে, কুয়েৎত্রী, ডংহৈ, রন্, ডীন্, থানহোয়া, নামডীন্ হয়ে হানয় পৌঁছি। হানয় পৌঁছবার পূর্বদিন সকাল বেলা নামডীন্ হতে দলে দলে নরনারীকে হানয়-এর পথ ধরে চলতে দেখে ভেবেছিলাম এরা কোথাও কাজের জন্য যাচ্ছে। এদের পেছনে না চলে এগিয়ে চলতেই বাধ্য হয়েছিলাম কারণ আজই আমাকে হানয় পৌঁছতে হবে। তিন মাইল পথ যাবার পর দেখলাম মস্তবড় একটা ফেক্টরী। সেখানে অনেকগুলি লোক দাঁড়িয়ে আছে। দুজন দারওয়ান তাদের পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। সাতটা বাজতেই ফেক্টরীর দরজা খুলে দিল। প্রত্যেকটি পুরুষ এবং নারী এক একখানা কাগজের টুকরা দারওয়ানদের কাছ থেকে নিয়ে ফেক্টরীতে প্রবেশ করল। অনেকগুলি লোক ফেক্টরীতে পৌঁছতে পারল না। যারা ফেক্টরীতে প্রবেশ করতে পারল না, তারা অনেকেই কতক্ষণ দাঁড়াল তারপর মুখ ফিরিয়ে কেউ যেই পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চল্‌ল। অনেকে পথশ্রমে কাতর হয়ে ফেক্টরীর দরজার কাছেই বসে পড়ল। যারা বসেছিল তাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। চোখের জ্যোতি ম্লান হয়েছিল। চিন্তিত মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছিল। কাজ করতে এসে কাজ না পাওয়া বিশেষ করে এই দরিদ্র লোকেদের যন্ত্রণাদায়ক কি আনন্দদায়ক মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। তাদের সামান্য আয়ের উপর কত শিশুর জীবন মরণ, কত বৃদ্ধের অকাল মৃত্যু নির্ভর করে সে খবর কে রাখে? তখনও আমি ঈশ্বর এবং ভাগ্য বিশ্বাস করতাম সেজন্য, এদের কথা ভাববার শক্তি

ছিল না। এদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে হানয় এর দিকে রওনা হয়েছিলাম।

এরপরে পথে এমন কিছু দেখতে পেলাম না যা আমার মনে দাগ কাটতে পারে। শুধু দুদিকের জমির দিকেই চেয়ে রয়েছিলাম। কি সুন্দর সে জমি। বিনা হালচাষেও ফসল হয়। জমির পশ্চিমে পার্বত্য ভূমি। এই পার্বত্য-ভূমির পূর্বদিকের সমতল ভূমিতে বৃষ্টির সময় পর্বত ধোয়া সার পড়ে এতই উর্বরা হয় যে, উর্বরতায় সোনার বাংলাকেও পেছনে ফেলে। আজ বরিশালের লোক যেমন খাদ্যাভাবে মরছে তেমনি তংকিন প্রদেশের লোকও দলে দলে অন্নাভাবে মরছিল। শিশু এবং বৃদ্ধের দুর্দশা দেখা অসহ্য হয়ে উঠছিল, আর সরকারী তাবেদার এবং ফরাসীরা আরামে দিন কাটাচ্ছিল।

বিকাল বেলা হানয় শহরে প্রবেশ করেই দেখলাম একজন ফ্রেন্‌চম্যান একটি আনামিত যুবকের চুল ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং কেন নিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলাম না। যে পথে চলছিলাম সেপথটি বড়ই সুন্দর। দুদিকের ফুট-পাথের উপর সুন্দর করে সারি দিয়ে গাছ। গাছের নূতন গজানো ডাল কেটে ফেলা হয়েছিল। সেজন্য গাছগুলি পুনরায় নবপত্রে শোভিত হতে বাধ্য হয়েছে। ফুটপাথ পরিস্কার। কলিকাতার মত নয়। নগরের বাসিন্দা ভাল করেই জানে ফুটপাথ হাঁটবার জন্য, দোকান করার জন্য নয়। ভিয়েতনামীরাও সেই আইন মেনে চলে। নেসনেলিস্ট চীনা ফুটপাথ পরিস্কার রাখা পছন্দ করে না সেজন্যই বোধ হয় যতগুলি চীনা দোকানের সামনে দিয়ে গেলাম, প্রত্যেকটা দোকানের সামনে চীনাবাদাম, লাউবিচি এবং সিমের বিচির খোসা দেখতে পেয়েছিলাম।

হানয় থাকবার জন্য একটি হোটেলের নাম পূর্বেই যোগার করেছিলাম। সেই হোটেলটি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শহরে প্রবেশ করেছিলাম দক্ষিণ দিক থেকে, আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, উত্তর দিকে রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে সেই হোটেল অবস্থিত। শহরে প্রবেশ করার পর দিক ভ্রম হয়। উত্তর দিক কোন দিকে তা বুঝতে না পেরে ভুলপথে আবার দক্ষিণ দিকেই চলে গিয়েছিলাম। শহরের বাইরে যাবার পর এক ভারতীয় দুগ্ধ ব্যবসায়ীর সংগে দেখা হয়। সেই লোকটি বড়ই অমায়িক। নিজেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথ দেখাবার জন্যে। আধ ঘন্টায় আমরা যথাস্থানে পৌঁছলাম এবং ভারতীয় দুগ্ধ ব্যবসায়ীর সাহায্যে ভাড়া ঠিক করে বিশ্রামার্থ উপরে চলে গেলাম। দুগ্ধ ব্যবসায়ী আমাকে স্থানীয় কতকগুলি সংবাদ দিল। সে যদিও দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত তবুও শহর সম্বন্ধে তার অনেক অভিজ্ঞতা ছিল।

লোকটির নাম কানাইয়া। কানাইয়া জিজ্ঞাসা করল, এই হোটেলের নাম তোমাকে কে দিল বাবু?

এই তোমারই মত একজন ভারতবাসী।

এই হোটেল কিন্তু ভাল নয়, এখানে যত বদমাসের আড্ডা। বদমাস কি রকম জানো? তারা হল স্বদেশী। ফরাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজের দেশ নিজেরাই শাসন করতে চায়। বেটাদের যেমন আক্কেল তেমনি সাজা। ফরাসীরা বিপ্লবীদের ধরে আর হত্যা করে।

সে যদি হয় তবে এই হোটেল পরিত্যাগ করাই ভাল, তুমি কি বল?

হোটেল ছাড়বার কথা বলছি না, কানাইয়া একটু জোর

দিয়েই বলল, তারপর সে জিজ্ঞাসা করল এখান থেকে তুমি যাবে কোথায় ?

হাইফং।

তবেত ভালই হয়েছে। ঐ যে দেখছ ডান দিকের রাস্তাটা, সিধা চলে গেছে হাইফং। এখানে থাকাই ভাল, তবে এই চেপ্টা নাকওয়ালাদের সংগে কথা বলো না। এখানে কয়েক দিন থাক, আমি আমাদের গোয়ালাদের কাছ থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে দেব, তাই নিয়ে তুমি হাইফং গেলে পথে অর্থাভাব হবে না।

আচ্ছা ভাই তোমাকে ধন্যবাদ। এখানে বড়ই গরম, আমি তোমার বাড়ীতে পরশু গিয়ে দই খেয়ে আসব, কেমন ?

সে তো খুবই আনন্দের কথা, এখন আমি চল্লাম, পরশু কিন্তু যেয়ো।

কানাইয়া বিদায় নিল। আমিও স্নান করে নিকটস্থ মুসলমান হোটেলে খেয়ে চিন্তা করতে লাগলাম "কই এখনও ত কেউ আসল না, বোধ হয় কেহই আসবে না। এ হোটেলের বড়ই বদনাম। আবার ভাবলাম তবে এই হোটেলের নাম এরা কেন দিয়েছিল ? ভিয়েতনামী বিদ্রোহীদের কথা চিন্তা করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল বেলা হোটেলের কাছেই এক পাঠানের সংগে দেখা হল। পাঠান বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিমান। আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন আমি নবাগত। ডেকে তাঁর কাছে বসিয়ে কাফি এবং রুটি মাখন খেতে দিলেন। কথা প্রসংগে বললেন, হাইফং হয়ে হংকং যাওয়াই ভাল। ইউনান্‌ফোঁর দিকে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। কেণ্টনের দিকে এখনও আইনের মর্যাদা আছে। চীন দেশে কোন পথে যাব সে কথা

আমার জানার বিষয় ছিল না। আমার জানার বিষয় ছিল উত্তর ভিয়েতনামের লোক স্বাধীনতার দিকে কতদূর অগ্রসর হয়েছে? পাঠান বুদ্ধিমান সেকথা পুর্বেই বলেছি। তিনি ভিয়েতনামীদের সম্বন্ধে কিছু না বলে ইন্‌টারন্যাসনেল পলিটিক্স নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সর্ব প্রথমই চানীন্ সোভিয়েটের কথা তারপর সোভিয়েট রুশিয়ার কথা। এই দুটি সোভিয়েটের একটি জীবন্ত ছবি আমার সামনে ধরেই জার্মানীর কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি স্পষ্ট কথায় বল্‌লেন, যে পর্যন্ত জার্মানী আবার যুদ্ধ না বাঁধায় সে পর্যন্ত কলনিয়েল দেশগুলি কোন মতেই মুক্ত হতে পারবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল্‌লেন ভিয়েতনামীদের গণ আন্দোলন ফরাসীরা এমনই সুচতুর ভাবে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে যে পৃথিবীর লোক ভিয়েতনামীদের সম্বন্ধে একটি কথাও জানছে না। আপনার কাছে অনেকেই চীনা ডাকাতের গল্প করবে। আপনার মনে আতঙ্ক এনে দিবে কিন্তু ভাববেন না, যাদের নিয়ে এই গল্প রচনা করা হয়, তারা ডাকাত, তারা হল প্রগতিশীল। যদি কোন দিন চানীন্ যান্ তবে প্রগতিশীল লোকের সংগে দেখা হবে।

পাঠানের কথা ভাল লাগছিল কিন্তু শুন্‌বার ফুরসুত ছিল না। তখন আমার মন শহরে ভ্রমণের দিকে চলে গিয়েছিল, সেজন্যে পাঠানকে অন্য সময় আসব জানিয়ে শহর দেখতে বেড়িয়ে পড়লাম। পথে বের হবামাত্রই একজন সংবাদ পত্রের রিপোর্টারের সংগে দেখা হয়। লোকটি আমার সাইকেল দেখে চিনতে সক্ষম হয়েছিল। সে আমাকে একটি কাফেতে বসিয়ে কয়টি প্রশ্ন করল। প্রশ্নগুলি যেমন মামুলী ছিল উত্তরগুলিও তেমনি ভাবেই দিয়েছিলাম। এর পরই রিপোর্টার জিজ্ঞাস করলেন চীন হয়ে সোভিয়েট রুশিয়া কেন যাবেন না? জবাব দেবার মত আমার কিছুই ছিল না, শুধু বল্‌লাম "আমার ইচ্ছা"। উত্তর

শুনে লোকটি যেন একটু দুঃখিত হল। তাকে সুখী করবার জন্য বললাম সোভিয়েট রুশিয়া আমাদের বাড়ির কাছে যখন ইচ্ছা তখনই যেতে পারব, এখন দূরের দেশগুলি দেখে নেই। এ কথা শুনে রিপোর্টারের মনে একটু আনন্দ হল। আসল কথা হল, সিংগাপুরে যেদিন পথের মানচিত্র তৈরী করেছিলাম সেদিন সোভিয়েট রুশিয়া পূর্ব রাশিয়ায় যে এতবড় সম্মান অর্জন করেছে তা আমার জানা ছিল না। সিংগাপুরে বসে শুনতাম সোভিয়েট রুশিয়া যেন একটি সত্যিকারের রোপইয়ক অথবা ক্রস ষ্ট্রীট। পিনাং শহরের রোপইয়ক নামক একটি গলি আছে সেখানে শুধু বারবনীতারাই থাকে। সিংগাপুরের ক্রসষ্ট্রিটের চারিপার্শটাও সেইরূপ। সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে তখন এই ধরনের নিকৃষ্ট এবং হীন প্রপেগেণ্ডাই চালানো হত।

প্রায় ঘণ্টা দুই শহরটি দেখে হোটেলে ফিরছিলাম। অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং পন্দিচেরীর তামিল রাজকর্মচারীদের সংগে দেখা হল। যাদের সংগে দেখা হয়েছিল তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের বাড়িতে থাকবার জন্য এবং খাবারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কারো অনুরোধ রক্ষা করি নাই কারণ এতে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। মন দুর্বল হয়। কথায় কথায় ডিটো মারতে হয়, আমার সেই প্রকৃতি নয় বলেই তাদের অনুরোধ রক্ষা করি নাই। অনেক ভারতবাসীই আমাকে চাঁদা দিয়েছিলেন আমি তা সানন্দে গ্রহণ করেছিলাম। তাদের বাড়িতে খেতে বলছিলেন এক বেলা করে খেয়েছিলাম। এর বেশী নয়। যদি এঁদের সংগে থাকতাম, এঁদেরই কথা শুনতাম তবে বাইরের লোকের সংগে আমার কোন সম্বন্ধ থাকত না।

দুপুর বেলা বসবার ঘরটিতে একা বসেছিলাম। হোটেলের মালিক আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, কোন কাজ

নাই ?" না ঘুমিয়ে ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ ধরে পথ চলেছি সে জন্য বাইরে যেতে ইচ্ছা করছে না। এখানে কোন ইংরেজী সংবাদপত্র নাই সেজন্য বসে বসে সময় কাটাচ্ছি। হোটেল মালিক তার ঘরে গিয়ে ফিরে আসলেন এবং আমার হাতে দুখানা ইংরেজী সংবাদপত্র দিয়ে বললেন, নিজের রুমে যান্ এবং চুপচাপ করে পড়ুন এবং পড়া শেষ হলে আমাকে গোপনে সংবাদপত্রগুলি ফেরত দেবেন। দুখানা সংবাদ পত্র পকেটস্থ করে রুমে গিয়ে খুলে দেখলাম একখানার নাম "উইকলী সাংহাই" আর অপর খানা হল "দি পিপুল" উভয় সংবাদ পত্রই সাংহাই হতে বের হত এবং প্রাচ্যে সর্বত্র বিতরণ হত। প্রকাশক অথবা সম্পদকের নাম তাতে ছিল না। বিদেশে এসে এই সর্বপ্রথম দু'খানা সংবাদ পত্র পেলাম, যাতে প্রকাশ্য ভাবে চীন সরকারের বিরুদ্ধে প্রাণ খুলে নানা কথা লিখা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় ভিয়েতনামীরা যে সকল গোপনীয় সংবাদ পত্র বের করত তার সবটাই আনাম ভাষায় প্রকাশিত হত এমন কি ফ্রেন্চ ভাষায়ও তাদের পত্রিকা প্রকাশ করত না। দক্ষিণ ভিয়েতনামীরা ইংরেজী এবং আনাম ভাষায় তাদের সংবাদ পত্র প্রকাশ করত শুনেছি কিন্তু দেখতে পাই নাই।

সে দিনই রাত্রে কয়েকজন ভিয়েতনামীর সংগে সাক্ষাৎ হয়। তারা মজুরদের মধ্যে সাহিত্য প্রচার করতেন বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু আচার ব্যবহারে সেরূপ কিছুই মনে না হওয়ায় আমি তাদের সংগে মন খুলে কথা বলতে সংকোচ মনে করছিলাম। তাঁদের কথার ফাঁকে এমন কতকগুলি কথা বের হয়ে পড়ছিল যা শুনে তাদের প্রতি ঘৃণাই আপনা থেকে জেগে উঠছিল। তারা বলছিলেন মজুর কি আর মানুষ হবে, ঈশ্বর যে তাদের মজুর করেই তৈরী করেছেন ইত্যাদি। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম মনে হয় আপনারা খৃষ্টান নতুবা মুসলমান,

বুদ্ধিস্টরা কখনও ঈশ্বরের কথা বলে অপরকে হেয় করে না। প্রকৃত-পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম মতে ভাগ্য এবং ঈশ্বরের কথা কোথাও বলা হয়নি। আমাকে খাটি বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বি মনে করে ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী নব যুবকগণ বিদায় নেওয়াটাই পছন্দ করছিলেন।

হানয় শহরে নূতন করে খৃষ্টধর্ম পত্তন হয়েছিল। মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় প্রগতিশীলরা তাই দেখে অবাক হয়েছিল। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মের কলহ এসে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারেনি। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কারসাজি অনেকে ধরে ফেলেছিল।

তৃতীয় দিন আমার দই খাবার কথা ছিল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম আকাশ অপরিস্কার। একটু শীত অনুভব হচ্ছিল। আমার গায়ে একটি মাত্র গেন্‌জি আর একটি পাতলা খাঁকির শার্ট ছিল। শীতটা যেন বেড়েই চলছিল। দুপুর বেলা নিকটস্থ রেঁস্তোরায় খেয়ে এসে বিছানায় বসা মাত্র মনে হল বেশ জ্বর হয়েছে। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলাম। শীত বেশ অনুভব হতে লাগল। বেল টিপামাত্র বয় এসে হাজির হল। তাকে হোটেলের মালিককে ডেকে আনতে বললাম। হোটেলের মালিক আসার পর আমার শরীর পরিক্ষা করে দেখতে বল্‌লাম। হোটেলের মালিক আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন জ্বর হয় নাই, হাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। আপনি গরম দেশ থেকে এসেছেন বলেই আপনাকে শীতে কাবু করেছে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। এই শীত আসল, আর কি ঘর হতে বের হতে পারবেন? আপনার শীত বস্ত্র নেই? একটু অপেক্ষা করুন এখনই আমি একটা কোট এবং একটা সোয়েটার নিয়ে আসছি। হোটেলের কাছেই একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর দোকান ছিল। তাকে সংগে করে নিয়ে এসে আমার

শরীরের মাপ নিয়ে একটা গরম আণ্ডারওয়্যার, একটা মোটা সোয়েটার এবং একটা দামী পশমী কোট নিয়ে এলেন। তৎক্ষণাৎ আমি বস্ত্র পরিবর্তন করলাম এবং নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হলাম। শীতের প্রকোপ অনেকটা কমল। তারপরই অনবরত প্রস্রাব হতে লাগল। কয়েকবার প্রস্রাব হবার পরই শরীর অর্দ্ধেক হয়ে গেল। মুখ শুকিয়ে গেল। ক্ষুধায় অস্থির করে তুল্‌ল। আমিও বেপরোয়া হয়ে খেতে আরম্ভ করলাম। তার পর দিন যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন দেখলাম শহরের চেহারা বদলে গেছে।

পথে লোক নাই। যে সকল দোকানে সরবত এবং তরমুজ বিক্রি হ'ত সেই দোকানগুলি রাতারাতি কাফির দোকানে পরিণত হয়েছে। পূর্বে এই দোকানগুলিতে কম লোক দেখেছিলাম আজ এই দোকানগুলিতেই লোক ভর্ত্তি দেখতে পেলাম। সকলেই গরম মাংস ভাজা, রুটি আর কাফি খাচ্ছে। আমি তাদের দলে যোগ দিলাম। যে সামান্য অর্থ ছিল তার সৎব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। দুদিনের মধ্যে শরীর অনেকটা ঠিক হল। সাইকেল নিয়ে পথে বের হলাম। ভিয়েতনামীদের রেঁস্তোরায় গিয়ে বসতে আরম্ভ করলাম। দেখতে পেলাম দরিদ্র মজুর সামান্য কাফে আর রুটি চিবিয়েই প্রাণ রক্ষা করেছে। তাদের মুখে কথা নাই, হাসি নাই, তারা যেন শীতের হাত থেকে রেহাই পেলেই বাঁচে। তখন চিনির অভাব ছিলনা। চিনি খুবই সস্তা ছিল কিন্তু ভিয়েতনামী মজুরদের ভাগ্যে চিনি জুটত না। তারা চিনিহীন কাফি আর রুটিতেই সুখী থাকতে বাধ্য হত।

এসব দেখার পর যখন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ঘরে যেতাম এবং আমার সামনে যখন তারা ক্রিম দেওয়া কাফির কাপ আমার হাতে দিতেন তখন ভাবতাম দরিদ্র ভিয়েতনামীদের কথা। তখন থেকে

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ঘরে খেতাম আনন্দ করতাম, সিনেমা দেখতাম আর সময় পেলেই নিকটস্থ বস্তিতে গিয়ে ভিয়েতনামী মজুরদের কাছে ভিক্ষা চাই গো বলে যখন দাঁড়াতাম তখন তাদের শুক্‌না মুখ, শিশুদের ক্ষুধার ক্রন্দন, মেয়েদের বস্ত্রহীনতা, বাবাদের উদাসীন ভাব দেখে আমিই দান করে চলে আসতাম। একদিকে প্রাচুর্যের আতিশয্য আর অপর দিকে দারিদ্রের নিষ্পেশন দেখে ভাবতাম এটা কি পূর্ব জন্মের পাপের ফল? তখন আমি এসব মানতাম। বুঝতাম না বলেই মানতাম আর কাঁদতাম।

নভেম্বরের শীত বড়ই দারুণ। উত্তর হতে ক্রমাগত ঠাণ্ডা বাতাস শহরটাকে জড়সর করেছিল। হানয়-এর দরিদ্র লোক বুঝতে পারছিল তাদের দুর্দিন আগত। প্রাণ বাঁচাতে হবেই। এদিকে ধনীর দল শীত আগত দেখে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। এবার তারা পেট ভরে ভিনো নামক মদ খেতে পারবে। নৃত্যশালাগুলি খুলছে। সিনেমা-গুলি ক্রমাগত সো দেখিয়ে যাবে। মনপ্রাণ দিয়ে তারা আনন্দ ভোগ করতে পারবে। এক দিকে অনাহার এবং অনিদ্রা অন্য দিকে প্রচুর আহার এবং নাক ডাকিয়ে নিদ্রা। আমি উভয় দলে থেকে উভয়ের মনোভাব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতাম।

সেদিন বোধ হয় নবেম্বরের দু' তারিখ। বাইরের লোক শীতে কি করে সময় কাটায় তাই দেখার জন্য হানয়-এর নিকটস্থ একটি গ্রামে যাই। গ্রাম্য পথে একটি লোকও চলাফেরা করছিল না। গ্রামের প্রত্যেকটি ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। মনে হচ্ছিল, গ্রাম ছেড়ে সকলেই যেন চলে গেছে। এদের ঘরের গঠন চীনা ধরণের ছিল না। আমাদের গ্রাম্য ঘরের সংগে বেশ সম্বন্ধ ছিল। গরম দেশের ঘরে শীত প্রবেশ করতে

পারে। উত্তর ভিয়েতনামীদের ঘরেও ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে প্রবেশ করছিল। শীত এবং গরম হতে রক্ষা পাবার উপযুক্ত ঘর তৈরী করতে হলে টাকা খরচ করতে হয়, গ্রাম্য লোকের অর্থ ছিল না সেজন্য তারা মামুলী ঘরে থেকেই শীত এবং গরম হতে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করত।

গ্রামের একটি মাত্র ঘরের দরজা খোলা দেখে তাতেই প্রবেশ করি। ঘরের লোক আমাকে পুলিশ ভেবেছিল। তাদের এই কু-ধারণা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেই নাই। পাসপোর্ট দেখিয়ে নিজের পরিচয় দেই। এতে গৃহের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সুখী হয় এবং আমাকে বসতে দেয়। ঘরের আসবাব দেখে মনে হচ্ছিল শীতের দেশের লোক এত দরিদ্র হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এর চেয়ে মৃত্যু বরণ করা ভাল। শীতে জর্জরিত হয়ে একটি শিশু কাঁদছিল। দুদিনের মধ্যেই শিশুর মুখের লাবণ্য লোপ পেয়েছিল। কতকগুলি ছেলে এবং মেয়ে ঘরের কোন্ ঘেসে বসে রয়েছিল। ঘরের ভেতর কোনরূপ খাদ্য দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "তোমাদের ঘরে গম, চাউল এসবের কি কিছুই নেই ?" সব ছিল, পুলিশ কিনে নিয়ে গেছে। শস্যের বদলে যে অর্থ দিয়ে গিয়েছিল তা নিঃশেষ হয়েছে, এবার উপবাস করতে হবে এবং মধ্যশীতের মধ্যেই মরতে হবে। আমরা এবার মরণের জন্য তৈরী হচ্ছি।

পরিবারটি শিক্ষিত কিন্তু অর্থাভাবে জর্জরিত। পরিবারের লোকের সংগে কথা বলে সুখী হয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম পরিবারের লোক সর্বসাধারণের জন্য কাজে নিযুক্ত। এদের বিরক্ত না করে গ্রামটা ভাল করে দেখে সহরে ফিরে আসি। শহরে তখন সন্ধ্যাবাতি প্রজ্বলিত হয়েছে। বড় বড় বারে (মদের দোকানে) ফরাসী, আনামিত এবং

অন্যান্য বিদেশীরা আরামের সহিত মদ খেতে মন দিয়েছে। বড় বড় রেঁস্তোরাতে খাওয়া আরম্ভ হয়েছে। ভিয়েতনামীরা ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যগুলি দেখছে আর ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটছে। ইত্যবসরে আমিও হোটেলে পৌঁছে এক পেয়ালা কাফি সেবন করে নিকটস্থ ভারতীয় ব্যবসায়ীর ঘরে খোস গল্পের মজলিসে যোগ দিয়েছিলাম। খোস গল্পের মধ্যে সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়েছিলো ভূতের গল্প। তারপর পলিটিক্স। পলিটিক্স গল্প বেশ জমল না কারণ পলিটিক্স চর্চা করতে হলে নানারূপ সংবাদ রাখতে হয়, তারপর কথাগুলি গুছিয়ে বলতে হয়। তখনকার দিনের বিদেশের ভারতবাসী ব্যবসায়ের কথাই গুছিয়ে বলতে পারত, পলিটিক্স নিয়ে কোন কথা বলতে সক্ষম হতনা। পলিটিক্সএর কথা শেষ করেই খেতে বসলাম এবং খাওয়া শেষ করে সিনেমায় গিয়ে রাত্র এগারটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করলাম।

এরূপ ভাবে দিন কাটানো ভাল লাগছিল না। হানয়ে আসার পর যে সকল ভিয়েতনামীর সংগে দেখা হয়েছিলো তারা ছিল কাজে ব্যস্ত। আমার সংগে কথা বলে তাদের সময় কাটাবার অবসর ছিল না। তারা আসত আর চলে যেত। আমি ছিলাম কথা প্রিয়। তারা আমার সংগে দুএক কথা বলেই চলে যেত। অনেকে আবার চীনদেশে সত্বর চলে যেতেও উপদেশ দিত। সেজন্য হানয় শহরে৷ আর থাকা ভাল হবে না ভেবে একদিন সকালবেলা হাইফং এর দিকে রওনা হলাম।

হানয় হতে হাইফং পর্য্যন্ত পন্চাশ কিলো মিটার পথ। পথটি বেশ সুন্দর। পথের দুদিকে জলভূমি। সাগরের জল পথের দুপাশেই জোয়ারের সময় ভরে যায়, আবার যখন ভাটা আসে তখন একেবারে শুকিয়ে যায়। সেজন্যই পথের সৌন্দর্য্য বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন

সুখের পথে আমার পক্ষে চলা কষ্টকর হয়েছিল। উত্তরের বাতাস পাহাড়ে আঘাত খেয়ে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে চলছিল। বাতাসের বিপরীত দিকে সাইকেল চালানো কত কষ্টের তা বলে বুঝান যায় না। অতি কষ্টে সারাদিন সাইকেল চালিয়ে যখন হাইফং পৌঁছলাম তখন মনে হল যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি।

এখানে আমার জন্য নির্দ্ধারিত কোন হোটেল ছিলনা, সেজন্য ইচ্ছামত একটি ছোট্ট এবং সুন্দর হোটেলে স্থান নেই। দৈনিক থাকার ভাড়া এক পেসো। আমার কাছে বেশ সস্তা বলেই মনে হয়েছিলো। পরের দিন সকাল বেলা যখন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম তখন সর্বপ্রথমই বাজারে বেলে-হাঁসের আমদানী দেখে, কিছু চিন্তা না করেই একটি সাইবেরিয়ান্ ডাক্ কিনে ফেলি এবং হোটেলে মালিককে তাই পাক করে দিতে বলি। হোটেলের মালিক ভিয়েতনামী। তিনি দয়া করে হাঁস পাক করে দিয়েছিলেন এবং সেদিন দ্বিপ্রহরে হাঁসটির মাংস এবং প্রচুর ভাত খেয়ে আর কোথাও না গিয়ে বিশ্রাম করি।

এখানেও অনেক দক্ষিণ ভারতীয় বাস করেন। আমার আসার সংবাদ তাঁরা পেয়েছিলেন এবং হোটেল হতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানকার দক্ষিণ ভারতীয়গণ ইউরোপীয়ানদের সমকক্ষ হিসেবে বসবাস করতেন। তাঁদের আথিক অবস্থা ভালই ছিল। চীন, জাপান, ফিলিপাইনও এদের সংগে সড়াসড়ি ব্যবসা করতেন। এদের ব্যবসাস্থল এবং বাসস্থান অনেক দূরে অবস্থিত থাকায় জন্য ব্যবসায়ী জীবন এবং গৃহস্থ জীবন সমান ভাবেই ভোগ করতে সক্ষম হতেন। এদের সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছিলাম, যদি ভারতবাসী উপযুক্ত নিয়মের মধ্যে থাকে তবে নাগরিক জীবন উত্তমরূপেই কাটাতে পারে।

সত্বরই উত্তর ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, সেজন্য ভিয়েতনামীদের প্রতি বেশ দরদ হয়েছিস। হাইফং-এর উত্তর দিকে কতকগুলি ভিয়েতনামী গ্রাম ছিল সেই গ্রামগুলিতে প্রায়ই যেতাম এবং গ্রামের লোকের সংগে কথা বলে কাটাতাম। গ্রামের লোক আমাকে আদর যত্ন করত এবং মনের কথা খুলে বলত। গ্রামের লোক অভাবের তাড়নায় কি করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করত, কিসে তাদের অভাব দূর হয় আমিও তাদের কথার জবাব দিতে পারতাম না। আমার মাথায় আসত না কিসে মানুষের অভাব দূর হয়।

হাইফংএ আমাকে দু সপ্তাহের মত থাকতে হয়েছিল। সপ্তাহখানেক থাকার পরই জানতে পারলাম আমাকে সন্তুষ্ট করলে নাকি যার যা মনের বাসনা তাই পূর্ণ হয়। এই সংবাদটি কে প্রচার করেছিল তা জানতে আমি চাই নাই, কিন্তু দরিদ্র ভিয়েতনামীরা নানারূপ ফল এবং সামান্য অর্থ নিয়ে যখন হোটেলের সামনে দাঁড়াত তখন আমি সে করুণ দৃশ্য দেখতে পারতাম না। ছেলেমেয়েকে অভুক্ত রেখে আমাকে সন্তুষ্ট করতে আসছে দেখে দুঃখিত হতাম। কারো কাছ থেকে কিছু নিতাম না। শুধু লোক সমাগম দেখলেই হোটেলের পেছন দরজা দিয়ে পালি[illegible] গিয়ে ভারতীয়দের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতাম।

এর পর থেকেই ধনী চীনা এবং আনামদের সমাগম হতে থাকে। এদের মুখ দেখলেই আমার মনে হত যেন কতকগুলি মানুষরূপী অমানুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের বলতাম, যাও দরিদ্র পাড়ার সেখানে গিয়ে মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ কর তবেই অর্থাগম আরও বেশি হবে। ধনীরা দরিদ্রকে অর্থ দান করত কি করত না তা দেখবার জন্য যেতাম না, কিন্তু মনে ধাঁধাঁ বাধত দরিদ্রকে যদি ধনীরা দান করে ত[illegible]

কি দারিদ্রতা সংসার হতে বিদায় নেবে? চীন দেশে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম দান করে সুখী হওয়া বাজে কথা। দান করে কেউ কখন অপরকে সুখী করতে পারে না।

হাইফং হতে হংকংএ যাবার খরচ এবং আলোচ্য বিষয় পুনরাবৃত্তি করলাম না, কারণ মরণ বিজয়ী চীনে এর পরের সকল ঘটনা বিশদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সমাপ্ত